অনাথবন্ধু।

(উপন্যাস)

দৈন্যঞ্চ পারতন্ত্র্যঞ্চ শিক্ষা বৈদেশিকী তথা।
স্বার্থোপদেশিনীত্যেতত্রয়ং বিঘ্নোঽদ্য চেদিহ॥
তথাপি শাস্ত্রদিষ্টেন ভক্তিমজ্জ্ঞান বর্ত্মনা।
সততং যো নরোযাতি ন স জাতু বিনশ্যতি॥

হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১৩০৩ সাল।

মূল্য ৷৵০ মাত্র।

এত ব্যয়সাধ্য বিদ্যা শিক্ষার পর, এবং বিবাহেরও পরে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া এক পয়সাও আনিয়া যে পিতার সাহায্য করিতে পারিতেছেন না, এজন্য অনাথবন্ধুর মনে বড় কষ্ট হইত।

অনাথবন্ধু পঠদ্দশায় ছাত্রসমিতিতে ছোট ছোট বক্তৃতা করিতেন। প্রথমে বক্তব্য কথাগুলি বাড়ী বসিয়া লিখিতেন—তাহার কাটকুট করিতেন—বিচারে ফাঁকি না থাকে অবহিত হইয়া দেখিয়া লইতেন; পরে মুখস্থ করিয়া তবে প্রকাশ্যে বলিতেন। সমপাঠীরা ও শিক্ষকেরা সকলেই তাঁহার বক্তৃতার এই বিশেষ প্রশংসা করিতেন যে, উহাতে কিছুমাত্র অসার কথা থাকিত না, এবং বিচার্য্য বিষয়ের অতি ধীরভাবে সমালোচনা ও প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের চেষ্টা হইত। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে অনাথবন্ধুর দু কথা গুছাইয়া বলিবার একটু ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি কুর্দ্দন ও হস্ত পদাদির আস্ফালন পূর্ব্বক অনর্গল অসার কথা বলিয়া সাধারণের তৃপ্তি সম্পাদনে অক্ষম হইলেও, তাঁহার অনেক পরিশ্রমার্জ্জিত বাক্‌শক্তিটুকু দ্বারা তিনি সহজে ও অতি সংক্ষেপে বাঙ্গালা এবং ইংরাজী উভয় ভাষাতেই আসল কথাগুলি বলিতে পারিতেন।

এখন অনাথবন্ধুর একান্ত ইচ্ছা যে, দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোনরূপ মোকদ্দমায় সধন নির্ধন যেমন মক্কেলই হউক এক জন কাহাকেও কিছু উপলক্ষ করিয়া

আদালতে দু কথা গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু তাহাই কি নব্য উকীলের পক্ষে সহজে ঘটিয়া উঠিতে পারে? মোকদ্দমা একেবারে না পাইলে কোথায় কি বলিবেন? অবশেষে যে সকল নিতান্ত গরীব আসামী দায়রায় উকীল দিতে পারে না, তাহাদের জন্য নিজের পয়সায় ষ্ট্যাম্প কিনিয়া ওকালতনামা দিয়া অনাথবন্ধু মোকদ্দমা লইতে আরম্ভ করিলেন। একটা চেষ্টা করা ত চাই, আর শুনিয়াও ছিলেন যে, ঐরূপ উপায়ে মোকদ্দমা লইয়া ভালরূপ কার্য্য করিতে পারিলে ক্রমশঃ পসার হওয়া সম্ভব—দু এক জনের তাহা হইয়াছে।

দায়রায় এইরূপ "অসমর্থিত পক্ষের" মোকদ্দমা অধিকাংশ সময়েই হারিয়া আসিতে হইত। "পূর্ব্বে শাস্তিপ্রাপ্ত" চোরের বা ডাকাইতি মোকদ্দমার আসামীর বিরুদ্ধে, প্রমাণে অল্প স্বল্প ত্রুটি জুরিরা সাধারণতঃ লক্ষ্য করেন না। সহজেই আসামীকে পাকা চোর ও বদমাইস স্থির করিয়া ফেলেন—পূর্ব্ব-শাস্তি-নিবন্ধন এবারেও দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। পুলিশ আবার প্রায়ই ওরূপ মোকদ্দমায় বিশেষ উপায়ে কলম-বন্ধ একরার দাখিল করিতে পারেন।

যাহা হউক, প্রমাণের ত্রুটি দেখাইয়া অনাথবন্ধু একবার একটি অতি দরিদ্র খুনী আসামীকে খালাস করিতে পারিয়াছিলেন।

—— x ——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জজ সাহেব।

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমন্তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি॥

আসামী খালাস হইবার অল্পক্ষণ পরেই জজ সাহেব অনাথ বন্ধুকে খাস কামরায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন। অনাথবন্ধু তথায় গিয়া বিনীত ভাবে অভিবাদন করিলেন। সাহেব একটু স্মিত মুখে একখানি চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বাবু! অপরাধীদের প্রতি তোমার এমন প্রগাঢ় প্রেম কেন হইল? শুনিতেছি তুমি বিনা "ফি"তে খুনীর মোকদ্দমায় তদ্বির করিতেছিলে।"

অনাথবন্ধু উত্তর করিলেন,—"হুজুর যখন আমার মক্কেলকে এইমাত্র বেকসুর খালাস দিয়াছেন তখন সে কি অপরাধী পদ বাচ্য হইবে?"

কথাটা জজ সাহেবের ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন—"আইনের মার প্যাঁচ কাটান প্রমাণ না থাকায় তাহাকে ছাড়া গেল বটে, কিন্তু লোকটা অপরাধী।"

অনাথবন্ধু বলিলেন, "হুজুর! আপনি বহুদর্শী বিচারক। পুলিশের চালানী সমস্ত কাগজ পত্র ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পান। অনেক কাল দেখিয়া শুনিয়া তাহার কোন অংশ নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারা যায় কি না, তাহা জ্ঞাত আছেন এবং এদেশের আচার ব্যবহার প্রভৃতি আপনার কিছুই অবিদিত নাই। কত প্রকার অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত সংবাদে সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন। আমি সে সকলের কি বুঝিব?"

সাহেব এদেশে পাঁচ বৎসরমাত্র আসিয়াই জজ হইয়াছেন। তাঁহার একবার মনে হইল যে আমি বিদেশী, এদেশের বিষয় বড় কিছু জানি না, পুলিশের অবিশ্বাস্য কাগজে এবং উড়ো কথায় সিদ্ধান্ত স্থির করি, ইশারায় বুঝি এইরূপ কিছু বলিতেছে; কিন্তু অল্পবয়স্ক পসার হীন ক্ষুদ্র উকীলের পক্ষে সেরূপ ধৃষ্টতার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, এবং অনাথবন্ধুর একান্ত বিনীত ধরণ দেখিয়া স্থির করিলেন যে তাঁহার প্রশংসাই করিতেছে।

তখন একটু স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনসেফেরা ও সব্ জজেরা তোমাকে 'কমিশনের' কাজ দেন না কি? আমি নূতন উকীলদিগকে ঐরূপে সাহায্য করা উচিত মনে করি। পসার স্থাপন চেষ্টাতেই তুমি এরূপ মোকদ্দমা লইয়াছিলে; কিন্তু দেখ অপরাধীর শাস্তিতে ব্যাঘাত করা কাহারও উচিত নয়। তোমার ধরণ ধারণ ভাল। বুদ্ধিও বেশ তীক্ষ্ণ। অল্প সময়ে জেরা শেষ ও দু চার কথায়

বক্তৃতা শেষ করিয়াছিলে। কোন প্রকার কষ্ট দাও নাই। কালে তোমার বেশ পসার হইবে। অপরাধীকে সাহায্য করার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করাই কি তোমার উচিত নয়?"

লাল মুখের প্রশংসা বড় কঠিন জিনিস। সাহেবের ধমকে যিনি বড় ভীত বা বিচলিত হন না, তিনিও সাহেবের প্রশংসা কাটাইয়া মনস্থির রাখিতে পারেন না— একেবারে গলিয়া যান! অনাথবন্ধু বাল্যাবধি কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইতে শিক্ষিত। কিন্তু সাহেবের মিষ্ট কথায় অনাথবন্ধুও বলিয়া ফেলিলেন,—"আপনি যেরূপ বলিতেছেন সেইরূপ করিব।"

কথাগুলি মুখ হইতে বাহির হইবা মাত্রই অনাথবন্ধুর মনে খট্‌কা লাগিল। মনে হইল 'একি প্রতিজ্ঞা করিলাম। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন প্রকার আসামীর পক্ষ সমর্থন আর কখনই করিব না! এইরূপ কর্ত্তব্য পরায়ণতাই কি এতদিন ধরিয়া শিখিলাম? পিতাকে গিয়া কিরূপে বলিব যে আপনার প্রদত্ত সমস্ত উপদেশ ইংরাজের এক মিষ্ট কথায় ভাসিয়া গিয়াছে! জজ সাহেবের মনস্তুষ্টি এবং তদ্দ্বারা পসার হওয়ার সম্ভাবনা কি এতই বড়! সত্য সত্য ত পসার অর্থাৎ টাকাই সব নয়। তাহার উপরের জিনিসও ত আছে!'—মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সকল কথা অনাথবন্ধুর মনের মধ্য দিয়া পার হইয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, এ সম্বন্ধে উকীলদের যাহা প্রকৃত কর্ত্তব্য তাহাই করিবেন। কর্ত্তব্য স্থির তখনই হইল।

প্রকাশ্যে জজ সাহেবকে বলিলেন, "এবার হইতে আমি আরো বিবেচনা করিয়া তবে কোন মোকদ্দমা লইব। যে মোকদ্দমায় আসামীকে সুস্পষ্টরূপে অপরাধী বলিয়া নিজের মনে ধারণা হইবে, বা যাহাতে বাদীর কি প্রতিবাদীর মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া বুঝিব, সেরূপ মোকদ্দমায় অনেক টাকা পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও অন্যায়ের পক্ষে ওকালতনামা লইব না—'এ মোকদ্দমায় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিব না' বলিয়া তাহা ছাড়িয়া দিব। তবে আপনি ত জানেন যে প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ থাকিলেই যে মোকদ্দমা সত্য হয় এমন নহে।"

অনাথবন্ধু জজ সাহেবকে খুব বিনীতভাবে সেলাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তিনি উকীলদিগের পুস্তকালয়ে ফিরিয়া আসিলে অনেকগুলি উকীল কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং জজ সাহেব কেন ডাকাইয়া ছিলেন ও এতক্ষণ ধরিয়া কি বলিতেছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সরকারী উকীল বাবুরই তখন সর্ব্বাপেক্ষা পসার অধিক। তাঁহার কবল হইতে আসামী বাঁচিয়া যাওয়ায় তিনি চটিয়াছিলেন। অনাথ বন্ধুকে শুনাইয়া বলিলেন, "ওঁকে জিজ্ঞাসা করিতে কেন হইবে। খুনী মোকদ্দমায় খুনীর পক্ষে তদ্বির করায় জজ সাহেব উহাঁকে সুমধুর সম্ভাষণ করিতেছিলেন। একথা কি আর জিজ্ঞাসা করে জান্‌বার দরকার হয়!" পরে অনাথ বন্ধুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন

"দেখ্‌লে ত বাবু! ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে কোন ফল নাই। মাঝে থেকে জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ হয়ে পড়ে! অনর্থক প্রবল প্রতাপ সাহেব রাজ-পুরুষদের অসন্তোষ উৎপাদন ক'রে যে কি ফল হয় তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না; তবে উহাতে দেশ-হিতৈষিতা বা বীরত্ব যদি কিছু থাকে ত বলা যায় না!"

সরকারী উকীল বাবুর শেষ কথাগুলি ইংরাজী ভাষাতে এবং প্রথমের বাঙ্গালা কথা কয়েকটিও একটু ফিরিঙ্গি সুরে উক্ত হইয়াছিল।

অনাথবন্ধু উত্তর করিলেন, "মহাশয়! জজ সাহেব আমাকে তেমন কিছু গালি মন্দ দেন নাই। তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তায় আমার আজ অনেক উপকার হইয়াছে। কথা কহিতে কহিতে আমার বেশ বোধ হইয়াছে যে, যদি কোন মোকদ্দমা অসত্য বলিয়া মনে সুস্পষ্টরূপে ধারণা হয়, তবে কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোনরূপ মোকদ্দমা লওয়া উচিত নহে। উপস্থিত ক্ষেত্রে আসামী নির্দ্দোষ ছিল বলিয়াই মনে হয়।"

সরকারী উকীল বাবু একটু বিদ্রূপের স্বরে হাসিয়া বলিলেন "ওহে! এ যে বিসমোল্লায় গলদ! আইনের নিগূঢ় মতের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা! সত্য হউক আর মিথ্যা হউক মোকদ্দমা লওয়া এবং মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করা উকীলের কার্য্য। যার খাই তার গুণ গাই, এই হ'ল ওকালতীর মূল সূত্র। উভয় পক্ষের তর্কের সংঘর্ষে তাড়িত

প্রবাহের ন্যায় সত্যও নির্ণয় হইয়া যায়। আর তা ছাড়া সত্য নির্ণয় করিতে জজ বাধ্য। সেটা বিচারকের কার্য্য। সে কার্য্যে তোমার আমার মাথা ব্যথা কেন?”

অনাথবন্ধু বলিলেন, “মহাশয় আপনার সহিত তর্ক করিতে পারি এমন সাধ্য আমার কোথায়? কিন্তু উভয় পক্ষের তর্কে সত্য নির্ণয় যে হইতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ। মনে করুন, এক পক্ষের উকীল হইয়া আপনি বক্তৃতা করিলেন; অপর পক্ষে আমি দু কথা বলিলাম। আপনি উত্তর দিবার সময়, অসামান্য বক্তৃতা শক্তিদ্বারা আমার মিনমিনে কথাগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন আমার পক্ষ সত্য এবং ধর্ম্মের পক্ষ হইলেও, আপনি যে তাড়িত প্রবাহের কথা বলিতেছিলেন, আপনার প্রবলতর পক্ষ হইতে সেই তাড়িত প্রবাহ বজ্রাঘাতের ন্যায় আমার মক্কেলের মাথায় পড়িয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিবে কি না?”

বক্তৃতাশক্তির প্রশংসায় সরকারী উকীল বাবুর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করিতে পারেন, এই বোধে আনন্দিত হইলেন। অনাথবন্ধুর সহিত উপস্থিত তর্কে যে পরাজয় হইয়াছে তাহা বুঝিতেও পারিলেন না।

অনাথবন্ধু পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, “আমার বাল্যাবধি এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, সত্যাচরণ হইতেই বংশের এবং সমাজের রক্ষা হয়, এবং সেই জন্য সত্যনির্ণয় করা

সকলেরই কর্ত্তব্য; জজের উপর সে কার্য্যের ভার দিয়া—নিজেরা সমাজের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া—কোনরূপে অসত্যের প্রশ্রয়ে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। ইদানীং মোকদ্দমা পাইবার ইচ্ছা বড়ই বেশী হওয়ায় ঐ কথা যেন একটু কম ভাবিতেছিলাম।"



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবন-সংগ্রাম।

ষড়্ দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥

দায়রার মোকদ্দমাটিতে জিত হওয়ার পরে অনাথবন্ধু ফৌজদারীতে ছোট খাট দু একটি মোকদ্দমা প্রায় প্রতি-মাসেই পাইতে লাগিলেন। কিন্তু জজ সাহেবের মুখে কমিশন দেওয়ার কথায় যে একটু আশা হইয়াছিল তাহা সত্বরেই ত্যাগ করিতে হইল। জজ সাহেব ওটা "কথার কথা" হিসাবে বলিয়াছিলেন। অনাথবন্ধুর বিশেষ উপকার করিবার জন্য তাঁহার কোনরূপ আগ্রহ হয় নাই এবং তাঁহার কথায় যে অনাথবন্ধুর মনে আশার উদয় হইবে এবং সেই আশা-ভঙ্গে যে একটু কষ্ট হইবে, "নেটিব" সম্বন্ধে অত কথা তিনি মনে রাখেন নাই। কমিশনাদি পূর্ব্বমত অন্যান্য লোকেই পাইতে লাগিলেন; কিন্তু কেন যে তাঁহারাই পান—অন্যে পান না—অনাথবন্ধুর তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি ছিল না।

অনাথবন্ধু ওকালতী ব্যবসায়ে কোন মাসে দশ কোন মাসে কুড়ি টাকা রোজগার করিতে লাগিলেন। কোন মাসে

বা কিছুই পান না। এরূপ অবস্থায় অনেকেই হতাশ্বাস হইয়া পড়েন, কার্য্যপ্রবণতা কমিয়া যায়—হাত পা যেন গুটাইয়া আইসে। এই দোষের পরিহার জন্য অনাথবন্ধু পিতার পরামর্শানুসারে উকীলদিগের পুস্তকাগারে বসিয়া আইনের পুস্তক পাঠ করিতেন। তাঁহার 'ডি এল' পরীক্ষা দিবার কল্পনা স্থির হইল।

এতদ্ভিন্ন, তিনি মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজের তেমন আয় না থাকায় অধ্যক্ষেরা প্রায়ই লেখকদিগকে উপযুক্তরূপ পারিশ্রমিক দিতে পারেন না। কেহ বা দিবার নামমাত্র করেন—দিতে পারেন না; কেহ বা টাকাটা সিকেটা কখন কখন দিয়া থাকেন।

বাঙ্গালা খবরের কাগজে লিখিয়া অনাথবন্ধু মধ্যে মধ্যে দু এক টাকা পাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু নিজের রচনা সংবাদ পত্রাদিতে মুদ্রিত দেখিলে যে কেমন একটু বিশেষ সুখ হয় এবং কোন বিষয়ে মাতৃভাষায় প্রবন্ধ লিখিলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান মনের মধ্যে যে সুশৃঙ্খল ও সুপরিস্ফুট ভাব ধারণ করে, তাহাকেই তাঁহার বাঙ্গালা রচনার প্রধান পুরস্কার বলিয়া গণ্য করিতে লাগিলেন।

ইংরাজী কাগজে লিখিবার ইচ্ছা অনাথবন্ধুর মনে একবারও উদয় হয় নাই এরূপ নহে, কিন্তু তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, ইংরাজ সমস্ত পৃথিবীর সার ধন সর্ব্বত্র হইতে পাইতেছেন—তাঁহার ভাষা আজ সকল জীবন্ত ভাষার

উপরে উঠিয়াছে। নিজের ক্ষীণ মাতৃভাষার পরিপোষণ চেষ্টা না করিয়া ওরূপ প্রবল বিদেশীয় ভাষার সেবা করিতে যাওয়া অনাবশ্যক ও অনুচিত। তবে যে সকল রাজনৈতিক বিষয়ে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে যুগপৎ আন্দোলন হওয়া আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে দেশীয়দিগের পরিচালিত ইংরাজী সংবাদপত্রের উপযোগিতা তিনি সুস্পষ্টই স্বীকার করিতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলিতেন— "এ দেশে ওরূপ ইংরাজী কাগজে খানিকটা করিয়া হিন্দী থাকা উচিত। হিন্দীর প্রচার বড়ই হিতকর।"

ওকালতীর আয়ে পরিবারের কোন সাহায্য হয় না দেখিয়া, অনাথবন্ধু একজন ভদ্রলোকের বাড়ী ছেলে পড়াইবার বন্দোবস্ত করিলেন। সন্ধ্যার পর দুই ঘণ্টা করিয়া ছোট আদালতের অন্যতম জজ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রদ্বয়কে পড়াইয়া অনাথবন্ধু মাসিক ২০৲ টাকা পাইবেন এরূপ স্থির হইল।

ঐ ছাত্রদের মধ্যে বড়টির নাম ভোলানাথ ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। দ্বিতীয়টির নাম বিনোদ বিহারী; সেটি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। এই নূতন কার্য্যে অনাথ বন্ধু খুব যত্ন করিতে লাগিলেন। ছেলে দুইটীকে সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার মন একান্ত একাগ্র হইল।

অনাথবন্ধু জানিতেন যে, বড় মানুষের ছেলেরা মাহিনা করা বাড়ীর মাষ্টারদিগকে স্বল্পই সম্মান করে; এবং ইহাও জানিতেন যে, শিক্ষকের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা

কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ভয় এবং ভক্তি দুইটি ভাব পরস্পরের অধিক দূরবর্ত্তী নয়। ছেলেদের যাহার উপর ভয় নাই তাহার উপর ভক্তিও থাকে না।

তিনি প্রথম দিনেই জজ বাবুকে বলিলেন, "আপ- ছেলেরা যাহাতে সুশীল এবং সুশিক্ষিত হয় তজ্জ যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; কিন্তু ছেলেরা যদি ... না শুনে, কি আমাকে অমান্য করে, তা ... দিগকে কে মারিবে?"

জজ বাবু বলিলেন, "... বলে আপনি যথেষ্ট মারপীট করিতে পা... পত্তি করিবে না। আর আপনার এই ... আমার সম্পূর্ণ ভরসা হইতেছে যে; ছেলে ... তে ভাল হইবে। সলোমন বলিয়া- গিয়া ... বেত্রাঘাতে ছেলে খারাপ হয়।"

... বলিলেন, "আমাদের চাণক্যও যথাকালে ছেলে ... ড়না করিতে বলেন।"

... ক ওকালতীর জন্য আলীপুরেই দিনের বেলা অধি ... সময় থাকিতে হইত। কিন্তু সেখানেও সময় বৃথা ... ইত না। আইনের বই পড়া, সংবাদপত্র পড়া, বাঙ্গা ... বন্ধ লেখা প্রভৃতি কার্য্যেই সময় কাটিত।

... অনাথবন্ধুর মাতার কঠিন পীড়া হয়। এত কার্য্য ... বন্ধু মাতার সেবায় যথেষ্ট যত্ন করিতে অবসর ... ফলতঃ কাজের লোকদিগের সময়ের অসদ্ভাব হয় ... লোকদিগের স্নান আহারেরও সময় জুটে না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিক্ষক ও ছাত্র।

প্রা[illegible]জসো মুনিবৃষা প্রথমঃ কবীনাং,
যৎপাবনং [illegible]পতেঃ প্রণীনায় বৃত্তং।
ভক্তস্য তস্য সমরং[illegible] মেহপিবাচঃ,
তৎপ্রত্যাসন্নমনসঃকৃতি[illegible] ভজন্তাং।
প্রতি মন্বন্তরং ভূতৈর্গীয়মান[illegible]চরিষ্যতঃ,
প্রাতঃ পবিত্রং লোকানামিয়ং চ[illegible]রিত্রপঙ্ক্তিব[illegible]

অনাথবন্ধুর দ্বিতীয় ছাত্রটিকে বাঙ্গালা পড়াইতে পড়াইতে একদিন মনে হইল যে, সাবেক কালের পাঠশালে ছেলেদের যে দাতাকর্ণ প্রভৃতি এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পড়ান হইত, তাহাই এ দেশের পক্ষে প্রকৃষ্ট শিক্ষার পদ্ধতি। বাল্যকালে রামায়ণ মহাভারতের বীরচরিত্র গুলির কথা মনে বসিলে চরিত্র সুগঠিত হয়।

অনাথবন্ধু নিজে শিশুবোধক রামায়ণাদি পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, আজকালকার পাঠ্য পুস্তকের গর্দ্দভ, বাঁদর প্রভৃতির বিবরণ ছাড়া দু একখানি ভাল বই ছাত্রদের দেখিতে দেন।

দুইটি ছাত্রের জন্য "শিশু রামায়ণ" ও "শিশু মহাভারত" কিনিয়া আনিয়া দিলেন। বলিলেন "এই দুইখানি তোমরা পড়িও। এ ছাড়া পদ্যে বড় রামায়ণ ও মহাভারত একটু একটু করিয়া আপনারা পড়িয়া ফেলিবে।"

ভোলানাথ দু দিনের মধ্যে "শিশু রামায়ণ" খানি পড়িয়া শেষ করিল। তখন অনাথবন্ধু "শিশু রামায়ণ" হইতে নিম্ন লিখিত উদ্ধৃত অংশ ভোলানাথকে বারবার পড়িতে উপদেশ দিলেন।

—"বালকের পক্ষে জন্মদাতা এবং শিক্ষা দাতার নিকট বশ্যতা স্বীকার করা এবং ভাই ভগিনীর প্রতি এমনি সস্নেহ ব্যবহার করা যে যাবজ্জীবন কখন পরস্পরের প্রেম বন্ধন শিথিল না হয়, যৌবনে কোন একটী গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের অভিলাষ মনে মনে পোষিত করিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইয়া যথারীতি সেই উদ্দেশ্য সাধনের দিকে অগ্রবর্ত্তী হওয়া এবং প্রৌঢ়াবস্থায় নিজ হস্তে কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলে প্রভুশক্তির একপে নিয়োগ করা যে তদধীন সকলেই সুখী হইতে পারে, এই সকল বিষয় রাম চরিতে অতি সুপরিস্ফুটরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর, কি বাল্য, কি যৌবন, কি প্রৌঢ়, সকল বয়সেই বিনীত, নির্ভীক এবং সত্যনিষ্ঠ হইতে হয়, এই কয়েকটি কথাও রামচরিত হইতে দৃঢ়রূপে শিখিতে পারা যায়। আর সকল ধর্ম্মের সার কথা অন্যের শুভ উদ্দেশ্য করিয়া এবং বিধি প্রতিপালন করিয়াই চলিতে হয়, নিজের সুখ দুঃখে উদাসীন হইতে হয়, ইহাও হৃদয়ঙ্গম হয়।"

পড়া শেষ হইলে অনাথবন্ধু বলিলেন, "দেখ! তুমি বড় লোকের ছেলে, তোমার মূর্খ হওয়া বড়ই বিসদৃশ হইবে।

লোকে বলিবে এত বড় লোকের বংশে কি মূর্খই জন্মিয়াছে! তুমি বিদ্বান্ হইলে তোমার পিতার মুখ উজ্জ্বল হইবে—তাঁহার পরম পরিতোষ হইবে। খুব পড়া শুনা করিব—খুব বিদ্বান্ হইব—ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য কর। চাণক্য শ্লোকে আছে,—

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনংসর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা।

এই শ্লোকটি মুখস্থ রাখিও।”

অনাথবন্ধু শ্লোকটির মানে বুঝাইয়া দিলেন।

এইরূপ উপদেশ দিয়া অনাথবন্ধু ভাবিলেন “আমার নিজের জীবনের উদ্দেশ্য কি? ধনার্জ্জনের ইচ্ছা খুবই প্রবল হইয়াছে। ধনার্জ্জন না হওয়ায় সাংসারিক অসুবিধা ঘটিতেছে। কিন্তু ধনার্জ্জনকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে বড়ই ছোট উদ্দেশ্য হইবে। এইমাত্র ছাত্রকে পড়িয়া শুনাইলাম যে জীবনের উদ্দেশ্যটি উচ্চ হওয়া আবশ্যক। আমি বাঙ্গালা ভাষার পরিপোষণ করিব। সে কার্য্য করিতে গেলে ইংরাজী বিজ্ঞান ও ইতিহাস এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করা আবশ্যক—আমি ঐ মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইব।”

কিন্তু তখনি নিজের সামান্য ক্ষমতার কথা মনে পড়িল। ভাবিলেন,” “আমি আবার লেখক হইব আর তাহাতে আবার ভাষার পুষ্টি হইবে!”—কিন্তু অভ্যস্ত কার্য্যপ্রবণতা গুণে অনাথবন্ধুর মন অধিকক্ষণ দমিয়া রহিল না।

মনে হইল, "আমার লেখা যদি স্থায়ী হইবার উপযুক্ত না হয়, নাই হইল! আমি ব্যারিষ্টার বোসের ন্যায় সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিব না বলিয়া ত ওকালতীর ইচ্ছা ত্যাগ করি নাই! ক্রোরপতি হইতে পারিব না বলিয়া ত ধনার্জ্জন ইচ্ছা ছাড়ি নাই! চিরস্থায়ী পুস্তক লিখিতে পারিব না বলিয়া কি মাতৃ ভাষার চর্চ্চা পর্য্যন্ত করিব না?"

আরও মনে হইল, "খবরের কাগজে একটু যত্ন ও চিন্তা সহকারে লিখিলেও ত উপকার আছে। দুই দিনে খবরের কাগজখানি মসলা বাঁধা কাগজে পরিণত হইবে সত্য, কিন্তু কোন ভাল কথা যদি দশজন পাঠকের মনে এক মিনিটের জন্যও ভাল লাগে তাহাতেই কি কম উপকার হইল? "বঙ্গবাসী" দেশীয় শিল্প রক্ষার জন্য বলিয়াছিল যে, দেশীয় শিল্পজাত বৈদেশিক জিনিসের অপেক্ষা দেখিতে নিরেশ হইলেও আপনার পিতা মাতা পুত্র কন্যা প্রভৃতির ন্যায় অবশ্য পোষ্য। সেই সুন্দর কথাটি কি কেহ কেহ যাবজ্জীবনের লক্ষ্য করিয়া ফেলেন নাই? সকল কার্য্যের ফলই চিরস্থায়ী বলিয়া ত শুনিয়াছি এবং বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি! আর সৎ চেষ্টার ফল ত অন্ততঃ পরজন্মেও পাওয়া যাইবে।"

——x——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কন্যা ও পুত্রবধূ।

কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥

অনাথ বন্ধুরা তিন ভাই এক ভগিনী। ভাই দুইটীর কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভগিনীটী সকলের ছোট, নাম "নলিনী"। তিন বৎসর হইল উহার বিবাহ হইয়াছে। কলিকাতা যোড়াসাঁকোয় শ্বশুর বাড়ী।

একমাত্র কন্যা নলিনীকে সুপাত্রে দান করিবার জন্য অনাথ বন্ধুর পিতা অনেক দিন ধরিয়া পাত্রান্বেষণ করিয়াছিলেন এবং শেষে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। —"অনাথ বন্ধু মানুষ হইয়া উঠিতেছে, আমার অবর্ত্তমানে সেই কোন প্রকারে সংসার চালাইতে পারিবে" ইহা মনে করিয়া তিনি সঞ্চিত তিন হাজার টাকার প্রায় সমস্তই ঐ বিবাহের খরচে প্রযুক্ত করিয়াছিলেন।—"এখন সমাজে যেরূপ নিয়ম পড়িয়াছে তাহাতে সচ্ছল ঘরে এবং সুপাত্রে কন্যা দিতে গেলে খরচ করা একান্তই আবশ্যক। আমরা তিন ভাইয়ে উপার্জ্জন করিলে টাকা আবার হইবে, কিন্তু নলিনী ভাল ঘরে না পড়িলে তাহার জন্য শোধ দুঃখ ও

আমাদের চিরকাল মনস্তাপ ঘটিবে।” এই কথা বলিয়া অনাথবন্ধুই এরূপ অতিরিক্ত ব্যয় সম্বন্ধে মাতার আপত্তি খণ্ডন করেন। অনাথ বন্ধুর মাতা বলিয়াছিলেন, “যাহাতে সমস্ত সঞ্চিত অর্থ যায় সে কাজ করা কি ভাল?”

এক কন্যার বিবাহে প্রায় সমস্ত সঞ্চিত সম্পত্তি ব্যয় করা সাধারণতঃ অসঙ্গত হইলেও অমন ভাল ছেলে এবং ভাল ঘর হাত ছাড়া করিতে অনাথবন্ধুর পিতার ইচ্ছা হইতে ছিল না। এ দিকে পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে নলিনীর বার বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইল।

নূতন আইনের দোহাই দিয়া কন্যাকে বড় জোর বার বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখা যায়, তাহার অধিক দিন রাখা বাল্য-বিবাহের একান্ত পক্ষপাতী রামজয় চট্টোপাধ্যায় কোন মতেই সঙ্গত মনে করিলেন না। শীঘ্রই বিবাহ দেওয়া আবশ্যক, সুপাত্রও পাওয়া গিয়াছে,—কিন্তু অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় না করিলেও বিবাহ দেওয়া ঘটে না—এ অবস্থায় কি করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। উপযুক্ত পুত্রের কথায় মাতা পিতা উভয়েরই মনে শান্তি সুখ আইসে এবং তাঁহারা তদনুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন।

এখন নলিনী পনর বৎসরে পড়িয়াছে। জামাইএর নাম আনন্দ নাথ—এইবারে বি এ পরীক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার পিতা সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় জাহাজী আফিসে ক্যাশিয়ারি কাজ করেন এবং নিজেও একটা চালানী কারবার

করিয়া থাকেন। কারবারে খুব লাভ হয়। হালের বড় মানুষ—কলিকাতায় আট দশ খানি বাড়ী ও দক্ষিণ দেশে এক খানি তালুক হইয়াছে।

বিবাহের পর হইতেই নলিনী অধিকাংশ সময় শ্বশুর বাড়ীতেই ছিল। মাতার বেশী অসুখের সময়ে বাপের বাড়ী আসিয়াছে এবং মাতার খুব সেবা ও যত্ন করিতেছে। এখন সেই রন্ধন করে। অনাথ বন্ধুদের বাড়ীতে এক ঝি ভিন্ন অন্য চাকর চাকরাণী নাই।

এক বৎসর হইল অনাথ বন্ধুর বিবাহ হইয়াছে। বৌটির নাম মহামায়া, বয়স ১১ বৎসর।

রামজয় স্থির করিয়াছিলেন যে, বার বৎসর পার না হইলে, এখন আর মেয়ে পাঠান কি বৌ আনা ভাল নয়। কিন্তু পত্নীর অধিক অসুখের সময় তাঁহার বৌ দেখিতে ইচ্ছা হওয়ায় এবং সেবা শুশ্রূষার কতক সাহায্য জন্যও বৌ আনিতে হইয়াছে।

অনেক দিন ধরিয়া কবিরাজী চিকিৎসার পর অনাথ-বন্ধুর মাতা ক্রমশঃ একটু সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

অনাথ বন্ধুর মাতা কন্যা নলিনীকে বলিতেছিলেন, "বড় ব্যারাম হয়েছিল বলেই মাকে আমার দু মাস দেখিতে পাইতেছি। আজ কদিন ধরে উঠে বস্‌তে পার্‌ছি। আর কি তোমাকে দেখ্‌তে পাব? শীঘ্রই বোধ হয় তোমার শাশুড়ী তোমাকে নিয়ে যাবেন।"

নলিনী একটু কাঁদ কাঁদ হইয়া রোগে শীর্ণা মাতার

মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মাতা বলিতে লাগিলেন, "তুমি শ্বশুর বাড়ী গেলে বৌমা একা পড়্‌বে। আজ বল্‌ছিল যে, এখন রাঁধিতে শিখিয়াছে—আমাকে আর কখন রাঁধিতে হইবে না। সব রকম কাজ শিখিবার জন্য যেন পাগল। তোমার কাছে সেলাই শিখ্‌ছে। আর বড় ইচ্ছা যে তোমার মতন মুখে মুখে সব রকম হিসাব কর্ত্তে শেখে।"

নলিনী বলিল, "বৌ সময় পেলেই শ্লেট নিয়ে ধরে ধরে লেখে। দাদা একদিন হেসে বলে ছিলেন যে, লেখার সৃষ্টি হয়েছে পড়্‌বার জন্য। সেই অবধি চেষ্টা করে হাতের লেখা অনেকটা ভাল করেছে। অক্ষরের ধরণটা অনেকটা দাদার অক্ষরের মতনই করেছে। ওর হিসাব শিখ্‌তে দেরী হবে। একশ-র বেশী গুন্‌তে জানে না। আমাদের বাড়ীতে যেমন করে শেখান হয়, তেমন কজনে জানে, না করে।"

নলিনীর মাতা বলিলেন, "ওঁর কাছে তুই যেমন শুভঙ্করী শিখেছিলি, অনাথ বলে, অনেক ডাগর ডাগর পাশ করা ছেলেও তাহা জানে না।"

নলিনীর মুখ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল। মনে পড়িল যে, তাহার শাশুড়ীর প্রশ্নে স্বামী আনন্দনাথ তাহার সাক্ষাতে কাগজ ও পেন্‌সিল লইয়া একটা সাংসারিক বিষয়ের হিসাব করিয়াছিলেন। নলিনী তাহার অগ্রেই তাহা মুখে মুখে করিয়াছিল। কিন্তু নিজের বাহাদুরী প্রকাশে

গিন্নির আর কিছু বলা হইল না। গিন্নি জানিতেন এখন সত্বরে জলযোগের ব্যবস্থা করিতে না গিয়া অন্য কোন কিছু বলিলে কর্ত্তার এত অভিমান হইবে যে সেদিন মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিয়াও আর কেহ তাঁহাকে জলবিন্দু স্পর্শ করাইতে পারিবে না।

—x—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সহধর্ম্মিণী।

দানে ক্ষয়তি নো বিত্তং ন চৌর্য্যৈ বর্দ্ধতে হি তৎ।
ন সন্ধ্যা পূজনৈর্লোকে সাধ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চন॥

আনন্দনাথ শ্বশুর বাড়ী যাইতে অনুমতি পাইলেন। শ্বশুর বাড়ীর যেরূপ ধরণ বুঝিয়া ছিলেন তাহাতে বিলাতি উগ্র সুগন্ধি, চকচকে বগলশ দেওয়া জুতা, চিত্র বিচিত্র করা কামিজ, সেই কামিজের হাতা টানিয়া রাখিবার বগলশ, আলবার্ট ফেশানের টেড়ি, মোটা হারের ন্যায় সোনার চেন, রঙ্গিন লতা পাতা কাটা ফুল মোজা, হাতে পাতলা ছড়ি প্রভৃতি জামাই-বাবু-সাধারণ সজ্জা তাঁহার কিছুই করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ঐ সকল করিলে সম্বন্ধীরা কিছু না বলুক মনে মনে হাসিবে। কিন্তু 'মিহির উপর থাপ'ওত এক রকম আছে। তাহাতেও বড় পরিশ্রম কম নয়! দেখিতে সাদা সিধের মধ্যেই একরূপ প্রচ্ছন্ন—সুতরাং উঁচুদরের—বাহার হইয়া গেল। চুল আঁচড়ান হইল, কিন্তু স্পষ্ট টেড়ি নাই। এত অল্প পরিমাণে আতর লাগান হইল যে হঠাৎ বুঝা যায় না।

উপস্থিত রাখিতে না পারিলে যেন জামাইয়ের অভ্যর্থনা কম হয়, যেন গৃহস্থের একটু ত্রুটি হয়। দু একজন মুখরা স্ত্রী-লোক কিছু কড়া রসিকতা করেন, তাহা রুচি বিরুদ্ধ এবং পরিত্যাজ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু জামাইকে এক প্রকার একা বসাইয়া রাখাও বাড়ীর কর্ত্রীর পক্ষে এক প্রকারের ত্রুটি বলা যাইতে পারে।

নলিনীর মাতার বিনয় ও সকলের প্রতি সহানু-ভূতিহেতু প্রতিবেশিনীরা সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। দু এক ঘরের মধ্যে যাওয়া আসাও ছিল।

নলিনী দেখিতে বেশ সুশ্রী, বড় মানুষের ঘরে বিবাহ হইয়াছে, অনেক গহনা হইয়াছে, ইহাতে সমবয়স্কাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে একটু ঈর্ষ্যা হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু নলিনীর ধরণ ধারণ বরাবরই তাহার মাতার মত বিনীত থাকায় কেহ সুস্পষ্ট ঈর্ষ্যা প্রকাশ বা সাক্ষাতে মর্ম্মভেদী কথা ঠারে ঠোরে বলিত না। তবে "এমনই কি সুন্দর?—এমনই কি বড় মানুষ?"—অসাক্ষাতে এ সকল কথা অবশ্যই হইত। হাজার হোক বাঙ্গালীর মেয়ে ত!

আনন্দনাথ শ্বশুর বাটীতে পৌঁছিয়া বহির্বাটীতে শ্বশুরকে প্রণাম করিলেন। আনন্দনাথ বেশ সুপুরুষ। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার শ্বশুরের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল।

নলিনীকে বেশ সুপাত্রে দিয়াছেন, তাহার শ্বশুর শাশু-ড়ীর নলিনীকে মনে ধরিয়াছে—এই সকল কথার সহিত

আনন্দনাথ বাড়ীর ভিতর আসিলে এহেন আরাধ্যা ঠান্‌দিদি প্রমুখ ঠান্‌দিদি ও শালী সম্পর্কিত দিগের দ্বারা কিরূপ সম্ভাষিত হইয়াছিলেন, কিরূপে ঠাট্টা তামাসায় মেয়ে মহল—ইদানীন্তন কালের "মার্জ্জিত রুচি" বিরুদ্ধ কিন্তু চিরপ্রথা অনুরূপ—আমোদ করিয়াছিল তাহার বর্ণন চেষ্টা করিব না। তবে খুব বাড়াবাড়ি হয় নাই এবং বহির্ব্বাটী পর্য্যন্ত শব্দ যায় নাই।

আনন্দনাথ হাসি মুখে ঠাট্টা সহ্য করিতেছিলেন। উত্তর মনে উঠিলেও তাহা মুখ ফুটিয়া বলিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। মাঝে মাঝে সোজা কথায় জবাব দিতে ছিলেন—তাহার উপরও ঠাট্টা। তিনি জানিতেন যে তামাসার জবাব দিলে তখনকার মত ঠান্‌দিদিদের কাছে বাহবা পাইবেন বটে, কিন্তু পরে মেয়েদের অন্তরে এবং তাহাদিগের নিভৃত সমালোচনায় নিরেশ জিনিস বলিয়াই ধার্য্য হইবেন।

এই সকল আমোদ আহ্লাদ জামাই-জাতীয়দিগের অগ্নিপরীক্ষা। মন খুব পরিষ্কার না হইলে জামাই অবশ্যই ধরা পড়েন। মেয়েদের চক্ষু হইতে মুখের এবং কথার ভঙ্গি একটুও এড়ায় না, সুতরাং মনের ভাবও ছাপা থাকে না।

নলিনীর মাতা আহারাদি সম্বন্ধে কোন প্রকার তামাসা করিতে দেন নাই। সেরূপ করিলে যদি জামাইএর আহারে একটুও অপ্রবৃত্তি হয়—তাহার অপেক্ষা অসুখের বিষয় আর কি হইতে পারে!

পাড়ার মেয়েরা নলিনীর মাতার কাছে জামাইএর সুখ্যাতি করিয়া চলিয়া গেলেন। আরাধ্যা ঠান্‌দিদি—যিনি কলিকাতার মধ্যে ও বাহিরে অনেক জামাই লইয়াই আমোদ করিয়াছিলেন—নলিনীর মাতাকে বলিলেন "তোমার ছেলেদের মতন নিখুঁত ছেলে এই তোমার জামাইকে দেখিতেছি আর বড় দেখি নাই।"

মুখের উপরে এমন অবস্থায় কেহই কখন মন্দ বলে না—সকলে "বেশ জামাই" বলিয়াই থাকে—কিন্তু "আন্ত-রিক কথার" এবং "কথার কথার" স্বর অনেক চেষ্টা করিয়াও একপ্রকার করিতে খুব কম লোকেই পারে।

দশম পরিচ্ছেদ।

-০✱✱✱০-

আট বৎসর পরে।

জনঃ স্বভাবেন চ শিক্ষয়া কৃতী।
র্বহ্বী র্বিভিন্না কুরুতে ভবেদ্ যথা॥
পরং স্বদেশীয় শুভং তথোদ্যমঃ,।
লোকে স্থিলোকী শুভ মাবহেৎধ্রুবং॥

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে সময়ের কথা জানাইয়াছি তখন হইতে আট বৎসর পার হইয়া গিয়াছে।

আট বৎসরে কতই পরিবর্ত্তন হয়! এক বৎসরের দুগ্ধপোষ্য বালিকার ততদিনে বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ হয়—দশ বৎসরের বালক ততদিনে বিভিন্ন মূর্ত্তি বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক হইয়া দাঁড়ায়। প্রৌঢ়ের বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া পড়ে। ততদিনে কলমের বাগানে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। কত নদ নদীর তট পরিবর্ত্তন, কত নূতন নূতন বাটীর নির্ম্মাণ, কত পুরাতন বাটীর ধ্বংশ সাধন হইয়া যায়!

কালস্রোতে আট বৎসর ভাসিয়া আমাদের পরিচিত ব্যক্তিবৃন্দের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাঁহারা কে কোথায় পৌছিয়াছেন—একবার দেখা যাউক।

অনাথবন্ধুর পিতা প্রকৃত প্রস্তাবে বৃদ্ধাবস্থাপন্ন, এবং

শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। আহারাদি অনেক কমিয়া গিয়াছে কিন্তু কোন বিশেষ রোগ নাই।

অনাথবন্ধুর মাতা চিররুগ্নাবস্থাপন্ন এক প্রকার শয্যা-গত, কিন্তু স্বামীর এবং পুত্র ও পুত্রবধূদিগের যত্নে এবং আর্য্য-নারী-সুলভ স্বাভাবিক সহিষ্ণুতার বলে মনের স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটা আছে। এক একবার রোগের যাতনায় মেজাজটা খিটখিটে হয়, কিন্তু তখনি তাহা বুঝিতে পারেন এবং যথাসাধ্য বিরক্তি দমন চেষ্টা করেন।

অনাথবন্ধুর স্ত্রী এক্ষণে উনবিংশবর্ষীয়া বাড়ীর বড় বৌ। তিনিই শাশুড়ীর পরামর্শ অনুসারে গৃহস্থালীর কার্য্য সমস্ত চালাইতেছেন। শাশুড়ীর সেবায় সকলের অপেক্ষা অধিক যত্নপর। একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। সেটি এখন তিন বৎসরের।

অনাথবন্ধুর মধ্যম ভ্রাতা রজনী বিএ পরীক্ষায় পাস হইয়া মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। দুই বৎসর হইল ডাক্তারী পাস হইয়াছেন। পিতা রামজয় চট্টোপাধ্যায়ের বরাবর ইচ্ছা যে, রজনী উত্তমরূপ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করেন। রজনী পিতার অভিপ্রায় অনুসারে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের নিকট যাতায়াত করিয়া এবং বাড়ীতে অপরিসীম পরিশ্রম করিয়া কালেজে পড়িবার সময়েই হোমিওপ্যাথি শিখিয়াছেন এবং একটু নৈসর্গিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকায় তাঁহার রোগ নির্ণয় এবং রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে সহজেই কতকটা পারদর্শিতা জন্মিয়াছে।

রজনী অতিশয় পরিশ্রমশীল। যখন যাহার চিকিৎসার জন্য আহূত হইতেন, তখনি তাহার বয়স, রোগের ইতিহাস, লক্ষণ, প্রভৃতি এক খানি বাঁধান খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। যে যে ঔষধ খাওয়াইতেন, এবং পূর্ব্বে খাওয়ান হইয়াছে বলিয়া শুনিতেন, তাহাও লিখিত থাকিত। চিকিৎসা শেষ হইলে মনে মনে চিকিৎসাটার সমালোচনা করিতেন। কোন্ ঔষধটা ভাল খাটিল, তাহাতে রোগীর ধাতু কি প্রকৃতির বলিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, এ সমস্ত ঐ খাতায় সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিতেন। সেই রোগীর কোন সময়ে আবার অসুখ হইলে ঐ বিবরণী হইতে চিকিৎসার অত্যন্ত সুবিধা হইবে—এই জন্যই এত পরিশ্রম করিতেন। ক্রমে ক্রমে যখন লিখিত খাতার বিভিন্ন বিবরণীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে তখনও আবশ্যকমত রোগীর বিবরণ সহজে খুঁজিয়া পাইবার জন্য বর্ণমালা অনুক্রমে নির্ঘণ্ট সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত করিতেন।

এইরূপে রোগীসম্বন্ধে সকল কথা লিখিতে গেলেই কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, কোন্ ঔষধটা প্রথমে দেওয়া ভুল হইয়াছিল, এ সকল বিষয়ও সুস্পষ্টরূপে মনে আসিত এবং তদ্দ্বারা নিজের চিকিৎসা সম্বন্ধে পারদর্শিতার ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছিল।

রজনী চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পরেই কয়েকটি উৎকট রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উপকৃত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন অতি প্রসিদ্ধ

লেখক—তিনি রজনীকে টাকা অতি সামান্যই দিতে পারিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিচিত বন্ধু বান্ধব অনেক। সকলেই রজনীর চিকিৎসা নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতে লাগিলেন এবং সহজেই রজনীর পসার বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। এখন রজনীর একটি বড় ডিস্‌পেন্সারি হইয়াছে।

চিকিৎসা কার্য্য অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হওয়ায় রজনী অধিক সময় পান না, তথাপি প্রত্যহ কতকটা সময় কবিরাজী চিকিৎসা শিক্ষায় অতিবাহিত করেন। রজনীর একান্ত অভিলাষ যে, দেশীয় ঔষধের মধ্যে কতক-গুলির পরীক্ষা বিধান করিয়া উহাদিগকে হোমিওপ্যাথিতে সংযুক্ত করিবেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, বিশ পঁচিশটা উৎকৃষ্ট দেশীয় ঔষধ সম্বন্ধে ঐ কার্য্য করিতে পারিলে অবশ্যই পাঁচ সাতটা সমস্ত পৃথিবীময় গ্রাহ্য হইবে। তদ্দ্বারা অপর দেশের লোকেরত উপকার হইবেই, মুখ্যতঃ স্বদেশের সম্মান বৃদ্ধি ঘটিবে।

তিনি মনে করিতেন, যদি পরীক্ষা বিধান করিয়া পরীক্ষার ফল প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিয়া পরে ইংরাজী চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পত্রে "বাঙ্গালা হইতে অনুবাদিত" বলিয়া ছাপান এবং ঐ সকল বাঙ্গালা মতের ঔষধের যদি বাঙ্গালা নামও বিদেশে পরিগৃহীত হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা বাহিরে কতকটা জাতীয় সম্মান বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং দেশীয় মোহান্ধ অনেক লোকের

কবিরাজীর উপর অশ্রদ্ধা কমিতেও পারে। অন্ততঃ হোমিওপ্যাথির মধ্যে দিয়া আসিলে তাহাদের এবং উৎকৃষ্ট কবিরাজ যে সকল স্থলে নাই তথায় অনেকের—উপকারে লাগিতে পারে।

অনাথবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংসার, সংস্কৃত ভাষায় এম এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে কলিকাতায় একটি প্রাইভেট কালেজে ৫০্ টাকা মাহিনায় মাষ্টারী করিতেছেন। অবসর কাল তন্ত্র পুরাণাদি পাঠে অতিবাহিত করেন। শাস্ত্র-প্রকাশ কার্য্যে ব্যাপৃত কোন যন্ত্রাধ্যক্ষের সহিত বন্দো-বস্ত হওয়ায়, সংসার সম্প্রতি বিশেষ যত্ন করিয়া একখানি অপ্রকাশিত তন্ত্রের পাঠ মিলাইয়া মুদ্রণের তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

অনাথবন্ধু এখন আর আলীপুরে যান না। কয়েক বৎসর ধরিয়া সিয়ালদহের আদালতেই ওকালতী করিতে-ছেন। কাছারী তাঁহার বাসার নিকটে। যাতায়াতে সময় নষ্ট খুব কমই হয়। তথায় এখন তাঁহার সর্ব্বোচ্চ পসার। মাসে তিন চারি শত টাকা আয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা মত বুঝিতে পারিলে মিথ্যা মোকদ্দমায় ওকালত নামা লয়েন না। পূর্ব্বাহ্নে বুঝিতে পারিলে মিথ্যা সাক্ষী কাহাকেও জবানবন্দী করিতে তোলেন না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার পসারের অধিক ক্ষতি হয় না। বেশী দামী দু চারটা মোকদ্দমা মধ্যে মধ্যে হাত ছাড়া হয়—কিন্তু সকলেরই নিকট সেজন্য তিনি সম্মানিত। বক্তৃতায়

খুব কম সময় লয়েন—আসল কথা কয়েকটি মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হয়েন—ইহাতে হাকিমদিগের বড়ই সুবিধা হয়। তাঁহার ঐরূপ বক্তৃতায় কাজও বেশী হয়—এমন কি অনেক রায়েই তাঁহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনার কথা অনেক অবিকল বসিয়া যায়।

জেরার সময় অপর কোন উকীলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দস্তুর মত হাত মুখ নাড়িয়া সামান্ত বিষয়ে প্রবল আপত্তি এবং গোলযোগ করিতে গেলে অনাথবন্ধু একটু মুচ্‌কি হাসেন এবং আদালতকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন আছে কি না? প্রায়ই প্রয়োজন হয় না—আদালতই মীমাংসা করিয়া গোলযোগ থামাইয়া দেন। মুন্সেফিতে এবং ফৌজদারীতে মোকদ্দমা করিয়াও অনাথবন্ধুর মনে ও ব্যবহারে একটুও বাজে মোক্তারী ধরণ সংক্রামিত হয় নাই।

এখন যেরূপ আয় দাঁড়াইয়াছে অনাথবন্ধু তাহাতেই সন্তুষ্ট। হাতে বেশী কাজ থাকিলে বরং মক্কেল ছাড়িয়া দেন, তথাপি এখানে দুমিনিট অপর এক আদালতে দুমিনিট দাঁড়াইয়া মক্কেলের পয়সা কুড়াইয়া মোকদ্দমার ভার ক্ষণে ক্ষণে অপরের উপর ফেলিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান না।

অনাথবন্ধু এখনও ছেলে পড়ান ছাড়েন নাই। জজ বাবুর পরামর্শেই তিনি সিয়ালদহে ওকালতী আরম্ভ করিয়া ছিলেন। তাহার পর শীঘ্রই পসার ভাল হইয়া আসিলে জজবাবু দেখিলেন, অনাথবন্ধুর আর ছেলে

পড়াইবার আবশ্যক নাই, কিন্তু অনাথবন্ধু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক সময় দিয়া তাঁহার ছেলেদের পড়ান। ইহা দেখিয়া তিনি ভদ্রতা পূর্ব্বক বলিলেন "অনাথ বাবু! আপনার সময়ের অপ্রতুল হয়। বিশ্রামের সময় থাকে না। ছেলেদের পড়াইবার জন্য ভাল দেখিয়া আর কাহাকেও জুটাইয়া দিন।"

অনাথবন্ধু একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন "আপনি এমন বলিতেছেন কেন? আমার দু পয়সা আসিতেছে বলিয়া আমার অজ্ঞাতসারেই কি পড়াইতে অযত্ন ঘটিয়াছে? যদি এমন হইয়া থাকে সেজন্য আমি বড়ই লজ্জিত হইব। আমার অসময়ে এই কার্য্য টাকার জন্য লইয়াছিলাম, কিন্তু আপনার ছেলেদের উপর আমার এখন স্নেহ জন্মিয়াছে। উহারা এল এ পাস করিলে—অথবা তৎপূর্ব্বেই যদি আমার সাহায্য আবশ্যক বোধ না হয়—তবে ছাড়িব মনে করিয়া ছিলাম। আপনার পরামর্শেই আমি সিয়ালদহে ওকালতী আরম্ভ করি। সাবেক মুন্সেফ বাবু আপনার পরিচিত বলিয়া প্রথম দিন হইতেই আমার প্রতি বিশেষ সযত্ন ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং আমার বিশ্বাস যে তাঁহার যত্নেই সিয়ালদহে আমার এত সহজে ও শীঘ্র পসার হইয়াছে। আমার বরং আপনার নিকট কিছু না লইয়াই পড়ান উচিত। কিন্তু সে কথা অনেকবার মনে হইলেও পাছে অন্য লোক রাখেন এই ভয়ে প্রস্তাব করিতে পারি নাই।"

অনাথবন্ধুর যতদিন ইচ্ছা তিনি ছেলেদের পড়াইবেন, এই কথাই স্থির রহিল।

অনাথবন্ধু এখন অতি সুন্দর বাঙ্গালা লেখেন। জলকষ্ট নিবারণ এবং দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের আবশ্যকতা দিন দিন সুস্পষ্টরূপে বুঝিতেছেন। ঐ দুই বিষয় এবং ভারত ইতিহাস হইতে স্বদেশীয় প্রধান প্রধান মহাত্মাদিগের জীবনচরিত সম্বন্ধে সর্ব্বদাই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন।

রামজয় চট্টোপাধ্যায় এখনও সেই সিয়ালদহের বাসা বাটীতেই আছেন, তবে পরিবার বৃদ্ধি হওয়ায় পাশের সংলগ্ন বাটীটীও ভাড়া লইয়াছেন। দুই বাড়ীই এক মালিকের। উপর তালায় দ্বার ফুটাইয়া দেওয়ায় দ্বিতীয় বাটীটীরও উপরতালা অনেকটা অন্দরের সামিল হইয়া গিয়াছে। উহার নীচে তালায় রজনীর ঔষধালয়।

রজনীর বিবাহ কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গায় হইয়াছিল। বৌটীর নাম কিরণশশী—দুই বৎসর হইল একটি ছেলে হইয়াছে। এই মেজবৌই সকলের অপেক্ষা সুন্দরী।

সংসারের বিবাহ তারকেশ্বরের নিকট একটি পল্লীগ্রামে হয়। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের কন্যা। বয়স এখন ১১ বৎসর।

নলিনীর দুইটী মেয়ে হইয়াছে। ছেলে হয় নাই বলিয়া নলিনীর শাশুড়ী মনে মনে বড়ই দুঃখিত। নলিনীর হাতে ও গলায় ঠাকুরদের মাদুলী চারি পাঁচ রকম বাঁধিয়া দিতেছেন। পুত্র সন্তান হইলে সমারোহে ৺ কালীঘাটে পূজা দিবেন,

মানত করিয়াছেন। বৌয়ের উপর ভালবাসা সমানই আছে। 'হয়ত আবার মেয়ে হবে। কিন্তু তাহা হইলেও আমি তেমন বিরক্ত হইব না। বৌমার সেজন্য ভয় নাই'—ইহা জানাইবার জন্য মাঝে মাঝে বলেন "তিন ভাইএর পরে আমার বৌমা তাঁর মায়ের এক মেয়ে এই জন্য তার পাল্‌টায় তিন মেয়ে না হলে বুঝি বৌমার ছেলে হবে না!" কখন বলেন "আমি যখন আনন্দের বিবাহের পূর্ব্বে বৌমার তিন ভাইএর কথা শুনিলাম তখনি মনে করিয়াছিলাম যে, ওবংশ ভাল, সুধু মেয়ে হওয়া গোষ্ঠী ভাল নয়। তখন থেকে আনন্দের অনেক ব্যাটা ছেলে হবে মনে মনে সাধ করিয়াছিলাম বলিয়াই বুঝি ঠাকুর দর্পচূর্ণ করিতেছেন!"

আনন্দনাথের পিতা আফিসের কার্য্য হইতে কিছু পেন্‌সন পাইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সওদাগরী আফিসের বড় সাহেব তাঁহার উপর বড়ই তুষ্ট ছিলেন।

আনন্দনাথ এমএ বিএল হইয়া হাইকোর্টের উকীল হইয়াছেন। আনন্দনাথের পিতা কলিকাতার বাড়ীগুলি এবং তালুকখানি আনন্দনাথের নামে লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নাম দিয়া দুদশটা চাঁদায় টাকা দিয়াছেন। অনেক বড় লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছেন এবং আনন্দ নাথকে মিউনিসিপাল কমিসনর, অনরেরি মাজিষ্ট্রেট, এবং ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবেল সোসাইটি, এসিয়াটিক সোসাইটি, জুওলজিকেল গার্ডেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন,

সায়ান্স অ্যাসোসিয়েসন, প্রভৃতি দু দশটা সভা সমিতির মেম্বর করিয়া তুলিয়াছেন। এ সমস্ত কার্য্যে আনন্দনাথের বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল না এবং বিষয় আশয় এবং চাঁদা দান নিজের নামে হওয়ায় বড়ই কুণ্ঠিত হইতেন। কিন্তু যখন পিতা বলিলেন যে "আনন্দনাথের" এইগুলি হওয়া তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন কাজেই ঐ সকল কার্য্যে তাঁহাকে স্বীকৃত, ব্রতী ও চেষ্টিত হইতে হইয়াছিল।

এখন আনন্দনাথের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের মেম্বর এবং রায় বাহাদুর উপাধি এই দুইটি হইলেই তাঁহার পিতার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। সে জন্য চেষ্টাও হইতেছে।

আফিসের বড় সাহেবের গবর্ণমেণ্টে খুব খাতির আছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরামর্শ মত গোটা কতক "গোছাল" দানে হাজার পাঁচ টাকা খরচ করিতে পারিলেই তিনি রায় বাহাদুর পদটা হাসিল করিয়া দিতে পারিবেন। অন্য লোকের পক্ষে অন্ততঃ দশ পনর হাজার লাগে। তবে যাঁহারা ক্ষমতাপন্ন মান্যগণ্য লোক, তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াও কোন প্রধান রাজপুরুষের খেয়াল মিটাইবার সাহায্য করিলে—এমন কি ঐরূপ বিষয়ে সুধু সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেই খেতাবের অপ্রতুল থাকে না। কিন্তু আনন্দনাথের পিতা তেমন নামজাদা লোক নহেন এবং তাঁহার স্বদেশদ্রোহী বলিয়া নাম বাহির করিতেও ইচ্ছা নাই। ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে ১০০০৲, ফুট বল সোসাইটিতে ১৫০০৲, মেয়ে হাঁসপাতালে ১০০০৲,

এবং ডায়মণ্ড হারবার সবডিবিজানে—যেখানে তালুক আছে—লাট সাহেবের ১৫ মিনিটের জন্য শুভাগমন উপলক্ষে প্রচুর দেবদারুর গেটের, সালুর পতাকার এবং কিছু জলযোগের ব্যবস্থার সমস্ত খরচ একা বহন করিয়া ১০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। এখন লণ্ডন রাজধানীর পূর্ব্ব অঞ্চলে বা কানেডায় বা অষ্ট্রেলিয়ায়—বিদেশে যেখানে হউক—একটু দুর্ভিক্ষের সংবাদ এবং কোথাও একখানা ইংরাজী জাহাজ ডুবি হইয়াছে এই সংবাদ আসার প্রতীক্ষায় বাকী ৫০০৲ টাকা চাঁদা দিবার জন্য মজুদ রাখা হইয়াছে।

ইউনিভার্সিটীর ভিতরে প্রবেশ জন্যও বন্দোবস্ত চলিতেছে। কয়েকজন বড় বড় সাহেব আনন্দনাথের পিতার একান্ত অনুরোধে কার্য্য সমাধা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আনন্দনাথ তাঁহাদের পরামর্শমত ইংরাজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিতেছেন। স্থির হইয়াছে যে, ঐ প্রবন্ধ লেখা শেষ হইলে উহা সম্পূর্ণরূপে সংশোধন পূর্ব্বক কলিকাতা রিভিউ বা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে সাহেবেরা আনন্দনাথের নামে ছাপাইয়া দিবেন এবং ইংরাজ সম্পাদিত কয়েকখানি খবরের কাগজে আনন্দ-নাথের ইংরাজী লেখার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে সহজেই সেনেটে ঢুকাইয়া দিবেন। ভোট জোগাড় করার কষ্ট পাইতে হইবে না।

আনন্দনাথের পিতা হীন-মস্তিষ্ক ব্যক্তি নহেন। এ সকল যে কিছুই নহে তাহা বুঝেন। এই সব চেষ্টায় যে অনেক

টাকা ও পরিশ্রমের অপব্যয় হয় তাহাও বুঝেন। কিন্তু সাধারণতঃ মনুষ্যের সাংসারিক ব্যবহার এবং ভিতরের মতবাদে সকল সময়ে "নিখুঁতভাবে" মিল পাওয়া যায় না। কাহার কাহার পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তত উঁচুদরের লোক ভাল লোকের মধ্যেই বা কয়জন?

আনন্দনাথের পিতা আনন্দনাথকে বলেন, "আমি তোমার বয়সে কি অবস্থায় ছিলাম, আর তোমাকে আমি সমাজের কিরূপ উচ্চপদে বসাইতেছি ইহা মনে করিলে আমার বড়ই সুখ হয়। আমার কাজ আমি করিলাম। এখন তোমার কাজ তুমি কর। এখন তুমি টাকা রোজগার কর, দান ধ্যান কর, দেশের লোকের সকল দিকে ভাল কর। ভাল করিবার কতকটা ক্ষমতা করিয়া দিলাম। এখন সাক্ষীগোপাল হওয়া বা দেশের একজন মুখপাত হওয়া তোমার ইচ্ছা ও চেষ্টার উপর নির্ভর করিবে। এতটা টাকা অপব্যয় করা আমার উচিত হইল কি না এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হইতে পারে। আমার একটু গর্ব্ব পরিতৃপ্তির জন্য কয়েক সহস্র টাকা অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে ব্যয় করিয়া অন্যায় করিয়াছি এ কথা কেহ বলিলে আমার উত্তর নাই। সে কথার কতকটা সত্য। কিন্তু তোমার এক্ষণে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইল তাহাতে তুমি দৃঢপ্রতিজ্ঞ হইয়া ধীরভাবে চলিলে স্বদেশীয়দিগের অনেক বিষয়েই কিছু কিছু উপকার করিতে পারিবে। তুমি যদি আমার মুখ রাখ—তুমি যদি এখন নিজের মানসিক উন্নতি

এবং স্বদেশীয়দিগের হিত চেষ্টাতেই জীবন যাপন কর—তাহা হইলে আমাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না। তুমি যদি উল্টা পথে যাও তাহা হইলে আমার কৃত কার্য্য আরও দোষের হইয়া দাঁড়াইবে। পুত্রের কার্য্যেই পিতার সুযশ বা কুযশ। ছেলে অন্যায় ব্যবহার করিলে লোকে তাহার পিতৃ পুরুষদিগকেই গালি দেয়।"



একাদশ পরিচ্ছেদ।

কাশীতে।

অসিবরণয়োর্মধ্যে পঞ্চক্রোশং মহত্তরং।
অমরা মৃত্যু মিচ্ছন্তি কা কথা ইতরে জনাঃ ॥

রজনীর কবিরাজী শিক্ষা এবং রাসায়নিক পরীক্ষা-বিধান কার্য্যের জন্য অনেকটা সময়ের প্রয়োজন হয়—এ দিকে পসার এরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে, দিন রাত্রের মধ্যে বিশ্রাম করিবার সময় নাই। মাসে প্রায় হাজার বার শত টাকা আয় দাঁড়াইয়াছে।

রজনীর স্ত্রী বাপের বাড়ীতে বাপে খুড়ায় পৃথগন্ন ভাব দেখিয়াছেন। তাঁহার বাপের বাড়ীতে ইহাও বলাবলি শুনিয়াছেন, "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁইত হবেই। আর হওয়াই উচিত। মনে কর, এক ভাই হাজার দেড় হাজার টাকা রোজগার করিতেছে, আর এক ভাই তিন চারি শত টাকা রোজগার করে, অপর এক জন পঞ্চাশ ষাট টাকা মাত্র পায়। এরা সকলে একত্রে থাকিয়া উহাদের ছেলেরা যদি উদ্বৃত্ত টাকার সমান অংশ পায়, সেটা কি উচিত ?"

এক দিন রজনীর স্ত্রী এইরূপ কথায় নিজের শ্বশুর বাড়ীর অবস্থার যেন ছবি তোলা দেখিয়া ভাবিল 'আমার স্বামীর এত টাকা রোজগার, তাহাতে আমার গহনা ও

একবার সমস্ত রাত্রি কোন রোগীর নিকটে থাকিয়া রজনী প্রাতঃকালে বাটী আসিলেন। খুব বড় মানুষের বাড়ীতে কঠিন রোগ। অপর কয়েক ঘর রোগী দেখিয়া আটটার মধ্যেই আবার উক্ত রোগীর কাছে যাইবেন, রোগীর পুত্রের নিকট এইরূপ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন।

রজনীর স্ত্রী বলিল, "এমন করিয়া কত দিন শরীর টিঁকিবে? কত টাকাই বা দিবে?"

রজনী বলিলেন, "এক শত টাকা দিবে। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের একান্ত জিদ অবহেলা করিতে পারিলাম না। রোগী নিজে থাকিতে বলিলেন, আমি থাকিব স্বীকার করাতেই যেন তাঁর মন একটু ঠাণ্ডা হইল। সুবিধায় সুবিধায় টাকা লইব, এমন সব সময়ে থাকিব না—এটা কি করা যায়? কাজেই থাকিতে হইল। রোগী রাত্রি টা থেকে ঘুমাইতেছেন। আমিও তখন পাশের ঘরে ইজি চেয়ারে ঘণ্টা দুই ঘুমাইয়াছিলাম।"

রজনীর স্ত্রী। এইরূপ সমস্ত রাত জেগে যে টাকা আনিবে, তাই কি তোমার থাকিবে? কেনই বা এত কষ্ট করে রোজগার কর?

রজনী একটু আশ্চর্য্য হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। মনে করিলেন, বুঝি 'সংসারের অনিত্যতা' সম্বন্ধে কথা হইতেছে। স্ত্রী জ্ঞানী ও বিরাগী আর নিজে সংসারে মুগ্ধ, এরূপ দশা বিপর্য্যয় ব্রাহ্মণের ঘরে কাহারও ভাল লাগে না।

রজনী একটু বিরক্তির স্বরেই বলিলেন, "টাকা কি মানুষ নিজের জন্য রোজগার করে? নিজে ক দিনের জন্য! সঙ্গে কেহ কিছু নিয়ে যায় না। তবে বাপ মা ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র এদের জন্যই লোকে রোজগার করে।"

রজনীর স্ত্রী একটু অপ্রতিভ হইল। পরে আস্তে আস্তে বলিল, "আমি ছেলের কথাই ভাবিতেছিলাম।"

রজনী আরও দু একবার স্ত্রীর নিকট তাঁহার টাকা কড়ির সম্বন্ধে তাঁহার বাপ মা ভাইয়ের সঙ্গে পৃথক্ ভাবে ছেলের কথার উল্লেখ শুনিয়াছিলেন। অন্য লোকে নিজের রোজগার বিষয়ে কেমন সেয়ানা—রজনীর মত হাবা নয়—এইরূপ ধরণের আভাষ।

রজনী স্ত্রীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে অত সঙ্কীর্ণতা ভাল নয়। তাঁহার স্ত্রীর বাপ খুড়ারা একত্রে যখন ছিলেন তখনই সমাজে আদৃত ও পরিবারের মধ্যে সুখী ছিলেন। পৃথক্ হইয়া সুবিধা হয় নাই। তাঁহার নিজের পরিবারের মধ্যে ভক্তি ও ভালবাসা থাকায় যে কি সুখ রহিয়াছে তাহা দেখাইয়া মনে হইয়াছিল বুঝি স্ত্রীকে বুঝাইতে পারিয়াছেন। আজ বোধ হইল যে স্ত্রীর মনের সঙ্কীর্ণতারূপ রোগের বৃদ্ধি বই কম হয় নাই। তাঁহার স্ত্রী বাপের বাড়ীতে শিক্ষিত সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি তাঁহার নিজ পরিবারের মধ্যেই যথেষ্টরূপে পরিচালিত করিতে ইচ্ছুক!

রজনী বেশ সচকিত লোক, অথচ একান্ত ধীর প্রকৃতিক। তিনি যথার্থই বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক।

সহজাত রোগ যাপ্য হয়—দমনে থাকে। কিন্তু কোন প্রকার অসাধারণ ঘটনায় ধাতু পরিবর্ত্তন না হইলে নিঃশেষ হয় না, ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস। যে বাড়ীর মেয়ে তাহাতে তাঁহার স্ত্রীর মনে তাঁহার নিজ পরিবারের সহিত সমানুভূতি কখনই তাঁহার ইচ্ছানুরূপ পূর্ণমাত্রায় হইবে না। যদি তাহার আশা করেন তবে সে আশা অবশ্যই নিষ্ফলা হইবে, রজনী প্রথম হইতেই একান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে মনে মনে এই সত্য স্বীকার করিয়া লইয়া ছিলেন। নিজে সতর্ক থাকিয়া যাহাতে তাঁহার নিজের মনে কখনও দোষ স্পর্শ না হয় এইটি দেখা এবং যত দূর সাধ্য বুঝাইয়া উদাহরণ দিয়া একটু একটু কাজ করাইয়া লইয়া তাঁহার পিতা মাতা ভ্রাতা ভাতৃ জায়া ভ্রাতুষ্পুত্রাদির উপর স্ত্রীর ক্রমশঃ কতকটা স্নেহ উদ্রেক করা মাত্র সম্ভব বলিয়া স্থির করিয়া ছিলেন। তবে এ সকল চেষ্টায় যে অনেকটাই উপকার হইবে এ আশা তাঁহার যায় নাই। সকলেইত আশার দাস!

রজনী আজ স্ত্রীকে বলিলেন, "ছি! ওকথা মনে আনিতে নাই। আমার প্রদোষ আর সত্যনাথ কি ভিন্ন? আপনার লোক আপনার, না দু দশ থানি খোলামকুচি বা টাকা আপনার? মানুষের অদৃষ্টে কখন কি আছে তাহা কে বলিতে পারে? আজ আমরা দুজনেই যদি হঠাৎ মারা যাই, তাহা হইলে আমি বেশ বলিতে পারি যে বড় বৌ ও দাদা আমাদের প্রদোষকে নিজের ছেলের চেয়ে বেশী যত্ন করে প্রতিপালন কর্‌বেন। কত দিন

আমাদের জন্য চোকের জল ফেলিবেন। সিন্দুকের ভিতর থেকে টাকা গুলি কি আমাদের জন্য কাঁদিবে, না ছেলের লালনপালন করিতে পারিবে? ব্রাহ্মণের ঘরে দুটা টাকা আসিলেই যদি ব্রাহ্মণের প্রকৃতি বদলাইয়া বণিক বৃত্তি পরায়ণ ফিরিঙ্গির ন্যায় বুদ্ধি হয়, তবে টাকাই সকল অনর্থের মূল বলিতে হইবে! বোধ হয় সেই জন্যেই শাস্ত্রে বলিয়াছে টাকা দানের জন্য। তোমাদের মন ভাল না হয় আমরা কয় ভাইয়ে পরামর্শ করিয়া শেষে সমস্ত টাকাটা না হয় দান করিয়াই যাইব!"

রজনীর স্ত্রী আর কিছু বলিল না। স্বামীর স্নানের জন্য তৈল আনিয়াছিল, ধীরে ধীরে ছল ছল নয়নে তাহা নিকটে রাখিল। কিরণশশীর মাতা তাঁহার জামাইকে "হাবা" বলিতেন সেই কথাই মনে পড়িল। কচি মেয়েদের কাছে বাপ মার জামাই সম্বন্ধে নিন্দা করার যে কত দোষ তাহার শেষ নাই!

কিরণশশী মাতার নিকট সকল কথাই বলিত। তিনিও খুঁটিনাটির সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন। এক সময় বলিয়া ছিলেন যে 'জামাই যদি হাবাই হয় তবুত তোর দেখা উচিত যে তোর বাছার উপর অন্যায় না হয়।'

কিরণশশীর স্বামীর প্রতি ভালবাসা খুব প্রগাঢ়। ভক্তিও কম নয়। কিন্তু "টাকাকড়ি রোজগার করা এক—আর রাখা এক। স্ত্রী ভাগ্যে ধন কথার মানে কি জান?—স্ত্রীরাখিলেই টাকা থাকে।" এই সকল কথা

মাতার নিকট শুনিয়া শুনিয়া ঐ বিষয়ে নিজের কোনরূপ চেষ্টা করা উচিত—ঐদিকে স্বামীর অক্ষমতা আছে, কিরণশশীর এইরূপ বোধ জন্মিয়াছিল।

নিজে তেমন ডাকা বুকো নয়—স্বামীর নিকট তাড়া পাইলেই চুপ করিতে হয়—তিনি রাগ করিবেন এই ভয়ে কাহারও সহিত সুস্পষ্ট ঝগড়া বিবাদ করিতে পারে না, অথচ শিক্ষার দোষে "ঝা"দিগকে একান্তই পর ভাবে—কিরণশশীর মনের ভাব এইরূপ।

স্বামীর নিকট মুখ তাড়া পাইয়া কিরণশশী লজ্জিত হইয়াছিল। রজনী চলিয়া গেলে অভিমানে নীরবে রোদন করিল। ছেলের প্রতি স্বামীর ভাল বাসা বড়ই কম বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তাহাকে যে কি করিতে হইবে এ অবস্থায় তাহা স্থির করিতে পারিল না।

মাতার নিকট যাইবার ইচ্ছা হইল। মাতার উপর খুব ভাল বাসা এবং মাতার মুখেই তাঁহার নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়া মাতাকে বড়ই বুদ্ধিমতী বলিয়া বিশ্বাস। কিরণশশী সেই দিনই বাপের বাড়ীতে পত্র লিখিলেন যে অনেকদিন তাঁহাদের দেখেন নাই। 'মা ভুলে যেতে পারেন কিন্তু মেয়ে তা পারে না।'

পরদিন রজনীর শ্বশুর নিজে আসিয়া মেয়েকে তিন দিনের করারে বাড়ী লইয়া গেলেন। রামজয় বলিয়া-দিলেন, "রজনীর ছেলেই এখন তাঁহার প্রধান খেলুড়ে। বেশী দিন না দেখিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

কিরণশশীর মাতা কন্যার নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া পরামর্শ দিলেন—"কান্নাকাটি এবং যত্ন আদর করিয়া ক্রমে ক্রমে জামাইএর মন বদলান আবশ্যক। এত লোকে পারে আর তুই পারবি না? ওই ওবাড়ীর নবৌ রোজগারী স্বামীকে বাপের সঙ্গেই পৃথক্ করেছে।"

কিরণশশী বলিল, "ওঁদের মন বদল হবার সম্ভব নাই। বড় রাগী নিজে যা ভাল বলেন তাহা আমি না করিলে কখন বলেন বিবাগী হয়ে চলে যাব—কখন বা বলেন দেশ বিদেশে আরও চিকিৎসা শিখিতে যাব। আমার ভয় করে।"

কিরণশশীর মাতা বলিলেন "তুই বড় অপদার্থ। তোর হতে কিছু হবে না—তবে কৌশলে কার্য্য উদ্ধার হতে পার্‌বে। তোর শাশুড়ী যে কাশীবাস কর্‌বার কথা বল্‌তেন তার কি হইল?"

কিরণশশী বলিল "যাবার কথা সর্ব্বদাই হয়। অসুখের জন্য হচ্ছে না।"

মাতা পরামর্শ দিলেন। রজনীকে কিছু না বলিয়া পাকতঃ কার্য্য উদ্ধারের পরামর্শ হইল।

কিরণশশী এবারে বাপের বাড়ী হইতে ননদপুত্র ও ভাসুর পুত্রের জন্য খেলনাদি লইয়া গেল। রজনীকে দেখাইল যে ভাসুরের জন্য কমফর্টর বুনিতেছে। স্বামীকে বলিল "মা ও বাবা দুজনেই এখন পৃথক হওয়ার জন্য দুঃখ করেন। বলেন সময় অসময়ে দেখিবার কেহই রহিল না। যদিও এক বাড়ীতে থাকিলেই

যে সবাই দেখে তাহা নহে—তবু লাঞ্ছনা ও ক্ষতি স্বীকার করে একত্রে থাকাই ভাল। ভিটে ছেড়ে এসে অবধি ব্যবসায়ে অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। বাড়ী আগেকার চেয়ে অনেক ভাল হইয়াছে। ঝগড়া কচ্‌কচি রেষারিষি নাই। কিন্তু তেমন ভাল কই হইতেছে?"

রজনী বুদ্ধিমান হইলেও আসলে সাদা সিদে লোক। সকলেরই ভাল দিক দেখিতে উন্মুখ। মনে করিলেন স্ত্রীর এবারে বাপের বাড়ী গিয়া উপকার হইয়াছে। তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী ঠেকে শিখে মেয়েকে সদুপদেশ দিয়াছেন। আরও মনে করিলেন যে তবে ঝগড়াঝগড়ির পরে যে একটু ঝাল থাকিয়া যায়, সেই জন্যই এবারের বাড়ী ভাল এবং এখন আর ঝগড়া কচকচি নাই এরূপ কয়েকটী কথা স্ত্রীর মুখে শুনিলেন।

কিরণশশীর যেরূপ লজ্জাভয়প্রণোদিত মৃদু স্বভাব আর রজনী যেরূপ রাসভারী উচ্চপ্রকৃতির পুরুষ তাহাতে কিরণশশীর মনের সঙ্কীর্ণতা ক্রমশঃই কমিয়া যাইবার কথা। কিন্তু নানা কারণে তাহা হয় নাই। বাপের বাড়ী খুব নিকটে, সঙ্কীর্ণমনা মাতার সহিত সর্ব্বদা দেখা হওয়া, তাঁহার কুপরামর্শ, বাপের বাড়ীতে ভাই ভাইয়ে বিবাদ, তথা কার গালাগালি মোকদ্দমা প্রভৃতির সংবাদ আসা—এই সকলই প্রধান কারণ। ছেলেটী হইয়া কিরণশশীর সন্তান বাৎসল্য প্রবল ভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছিল। ঐ সন্তান বাৎসল্যের সহিত মাতৃপ্রদত্ত সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি জড়াইয়া যাওয়াতে

স্বামীকে বিষয় বুদ্ধিহীন বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল এবং "বাছার জন্যে" নিজের বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক বোধ হইয়াছিল।

একদিন কিরণশশী শাশুড়ীকে বলিল, "আমার মাসিমারা এবারে গ্রহণের সময় কাশী যাবেন। মথুরা বৃন্দাবন সব দেখে আসবেন। আমি নাকি খুব ছেলেবেলা মার সঙ্গে একবার কাশী গিয়াছিলাম—কিন্তু তথাকার কিছুই মনে নাই।"

অনাথবন্ধুর মায়ের কাশীবাস করিবার ইচ্ছা বরাবরই ছিল; কিন্তু ছেলে, বউ, মেয়ে, নাতি প্রভৃতির মায়ায় কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার কল্পনায় মনস্থির করিতে পারিতেছিলেন না। মধ্যে কয়েক দিন রোগ কম থাকায় কাশী যাইতে পারা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইলনা। বিশেষতঃ কেহ তীর্থস্থানে যাইতেছে শুনিলেই বাঙ্গালীর মেয়েদের তথায় যাইতে প্রবল ইচ্ছা হয়।

স্বামীকে বলিলেন, "আমাকে এইবারে কাশী লইয়া চলনা কেন? আবার যখন অসুখ বাড়িবে তখন আর যাওয়া হইবে না। তবে এদের ছেড়ে কি করে যাই?"

রামজয় বলিলেন, "আমারও মনে হইতেছিল এইবারে কাশী যাই। ঠাঁই বদলে তোমারও শরীর সারিতে পারে, আর কাশীতে গেলে মনে কেমন একটা শান্তি আসে; মায়া মোহ অনেকটা যেন কমে যায়। ছেলেরা সব মানুষ হইয়াছে, অনাথ ভাইদের নিয়ে থাকুক, আমরা কাশী গিয়ে থাকি।"

অনাথের মা বলিলেন "মেজ বৌমার বড় কাশী দেখ্‌বার সাধ, সে যেতে চায়।"

রামজয় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "যেতে চাইবে না কে?"

অনাথের মা। "এবারে আমার যাওয়া হইতে পারে শুনে যেতে সবাই চাচ্ছে। আমার যে সেবার দরকার বড় বৌমা তাহা কিছু বলিলেন না, কেবল বলিলেন 'আমি কখনও কিছু দেখি নাই। মা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও।' আমার বোধ হয় কাশী যাওয়া ঘট্‌বে না। বড় বৌমাকে ছেড়ে, ছেলে নাতিদের ছেড়ে, আমি স্থির থাক্‌তে তো পার্‌বো না।"

এই সময়ে অনাথবন্ধু সেই স্থানে আসিলেন। শেষের কতকগুলি কথা তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। বলিলেন "আমাদের পরশু থেকে এক মাসের জন্য দেওয়ানী আদালত বন্ধ হইবে। তার মধ্যে বার দিনের জন্য ফৌজদারী আদালতও বন্ধ হইবে। আমি তোমাকে নিয়ে গিয়ে এক মাস ধরে সেখানেই থাকিতে পারিব। সকলেই এখন আমাদের সঙ্গে চলুক না। ও দেশের ভাল হাওয়ায় সকলে বেশ সারিবে।"

এ প্রস্তাবে সকলেরই মত হইল। রজনী চিকিৎসা ছাড়িয়া যাইতে পারে না। তাঁহার ছাড়া সকলেরই কাশী যাওয়া স্থির হইল। সংসার ভাবিলেন, 'কাশীতে কালেজের ছুটীর একমাস দণ্ডীদের কাছে উপনিষদ পড়িব।' কার্য্যও এই সকল ব্যবস্থার অনুসারে করা হইল।

——***——

হয়। স্ত্রীকেই বকে। সুধু দোষের উল্লেখ ক্রমশঃই চলিতে থাকিলে ভাবে "দোষের কথা আমি জানি। অত বলে কি হয়? আর কখনও কোন বিষয়ে ভাল বলেন না কেন? অতটা বিরূপতা ভাল নয়।"

অনাথবন্ধু ভ্রাতার মানসিক সুখের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহার করিতেন।

রজনী তাহার স্ত্রীকে কখন কোন দোষের জন্য বকিয়াছে ও রাগ করিয়াছে—কিন্তু তাহার ভাসুর তাহার সেই কাজের মধ্যে ভাল ভাগটুকু দেখাইয়া ভ্রাতাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন এরূপ দুই একবার হওয়ায়, রজনীর স্ত্রীর তাহার ভাসুরের উপর একটু ভিতরে ভিতরে ভক্তি ছিল। মাতার পরামর্শেও বিদ্বেষ ঘটিতে পারে নাই।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

****

মাতৃ বিয়োগ।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

ইহার পর এক বৎসর কাল অনাথবন্ধুর মাতা কাশীতে রোগ ভোগ করিলেন। প্রাচীন বয়সের রোগ দু দশ দিন খুব বাড়ে, আবার দু দশ দিন কিছু ভাল যায়—কিন্তু ক্রমশঃই শরীর ক্ষয় হইয়া পড়ে।

একদিন দুপুরের পর খুব অসুখ বৃদ্ধি হওয়ায় অনাথের মাতা ক্ষীণ স্বরে অল্পে অল্পে অনাথবন্ধুকে বলিলেন. "রজনী সাত আট দিন ধরে এখানে ছিল, দুদিন একটু ভাল বোধ হওয়ায় জেদ করিয়া কলিকাতায় ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। কিছুতে যেতে চাইলে না—বৌমাকে রেখে গেল। সে ডাক্তার মানুষ বুঝ্‌তে পেরেছিল। আমি বুঝ্‌তে পারি নাই। তাকে আস্‌তে তারে খবর দাও; তোমাদের সকলকেই একত্রে দেখে যেতে ইচ্ছা কর্‌ছে!"

অনাথবন্ধু কিছু পূর্ব্বে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়া রজনীর আসিবার জন্য টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন। খবর দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া রোগীর মুখে একটু সন্তোষের চিহ্ন দেখা দিল।

সেই দিন বৈকালে অনাথের মাতা বড়ই ছট্ ফট্ করিতে করিতে বলিলেন "আমার বড় প্রাণ কেমন করিতেছে। রজনী কতক্ষণে আসিবে?"

অনাথবন্ধু বলিলেন যে পরদিন বেলা দুই প্রহর নাগাদ আসিবে।

ইহার পরক্ষণেই অনাথবন্ধুর মাতা চক্ষু বুজিলেন। একটু তন্দ্রা আসিল। কিছু পরে হঠাৎ সুস্পষ্ট চীৎকার করিয়া উঠিলেন "তোমরা সবাই আমার রজনীকে তোল। রজনী জলে জাহাজের তলায় পড়িয়াছে—উঠিতে পারিতেছে না!"

রোগী সবলে উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই চতুর্দ্দিকে চাহিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মুখে জল দিতে দিতে চৈতন্য হইল। চক্ষু চাহিয়া অনাথকে বলিলেন "কৈ রজনী? সে যে আমার মাথায় হাত বুলাইতে ছিল।"

অনাথ বলিলেন, রজনী কাল দুপুরের মধ্যে আসিবে। অনাথের মাতা বলিলেন "না, রজনী যে এইমাত্র আমার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া হাত বুলাইতেছিল।"

কবিরাজ হাত দেখিয়া একটু মৃগনাভি ও মকরধ্বজ দিলেন, রোগী আবার তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

রাত্রিটা কোনরূপে কাটিয়া গেল। কিন্তু শেষ রাত্রি হইতেই শ্বাসে ও নাড়ীতে বিশেষ দোষ দেখা গেল। পরদিন প্রাতে অনাথের মাতা অনাথের স্ত্রীকে ইশারা করিয়া কানের কাছে মুখ আনিতে বলিলেন। স্বর বড়ই অস্পষ্ট।

বলিলেন, "সকলকে ডাকাও।" রামজয়, অনাথ, সংসার, নলিনী, আনন্দনাথ, (তিনি চারিদিন পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন) সকলেই নিকটে আসিলে অনাথের মাতা সকলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। মুখ হর্ষযুক্ত হইল। অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন "রজনী"। অনাথ কথা শুনিতে পাইলেন না কিন্তু ঠোঁট নড়াইতেই বুঝিতে পারিলেন যে মাতা রজনীর কথা বলিতেছেন। উত্তর দিলেন "আজই খানিক বাদে আসিবে।"

কবিরাজ হাত দেখিয়া বাহিরে গেলেন। অনাথ সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে গেলে বলিলেন "এ সময়ে গঙ্গাতীরে লইয়া যাও। এখন যেন কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটী হয় না।"

স্নেহময়ী মাতার সম্বন্ধে এরূপ সংবাদে অনাথবন্ধুর মনে যে কি হইল এবং পরিবার বর্গের মধ্যে যে কিরূপ ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল, তাহা বর্ণনা করা বড়ই কষ্টকর এবং বাঙ্গালী পাঠককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা বাহুল্য মাত্র।

সকলকে কথঞ্চিৎ থামাইয়া গঙ্গাযাত্রা করা হইল। রামজয়ও যষ্টিতে ভর দিয়া সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে গেলেন। পত্নীর চিরকালের সাধ যে তাঁহার পা ছুঁইয়া থাকিয়া গঙ্গাতীরে পুত্রপৌত্র কন্যা জামাতা দৌহিত্রাদি পরিবৃত হইয়া মৃত্যু হয়। বহু সহস্র বার এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জীর্ণদেহ বৃদ্ধ মর্ম্মান্তিক কষ্ট গোপনে রাখিয়া আজ সেই আযৌবনের প্রতিশ্রুতি পালন করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যাইতেছেন!

গঙ্গাতীরে পৌঁছিলে সেই পবিত্র বায়ু স্পর্শে মুমুর্ষু যেন একটু সুস্থতা অনুভব করিলেন। আবার একবার তন্দ্রা পরিষ্কাররূপে কাটিয়া গেল। গঙ্গোদক মুখে দেওয়ার পর মনে মনে ইষ্টমন্ত্র বলিলেন। ইঙ্গিতে পতির পাদোদক মস্তকে দিতে বলিলেন। তৎপরে যেন কাহারও মস্তকে হাতদিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন এইরূপ ভাবে কম্পিত হস্ত তুলিয়া ক্ষীণজড়িত স্বরে বলিলেন "রজনী বাপ আমার!"

রজনী আসিয়া পৌঁছিবার সময় হইল না দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। মাতার ঐ কথা যে মনে একান্তই লাগিয়াছে, শেষ সময়ের এই কথায় অনাথবন্ধুর তাহা আরো বেশী বোধ হইল। কিন্তু এই প্রলাপ বাক্যের পরক্ষণেই মুমুর্ষু অনাথের দিকে চাহিয়া স্বামীর সম্বন্ধে এরূপ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিলেন যে দেখা গেল যে জ্ঞানের ত্রুটি হয় নাই। ভগ্ন হৃদয় জীর্ণ শরীর স্বামীকে এই আঘাতের পর বিশেষ করিয়া দেখিতেই জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর আদেশ করিলেন।

মুমুর্ষুর পক্ষে উপযুক্ত দৈব ক্রিয়া সমাধা হইল। অনাথের মাতা তখন সেই হরিধ্বনির মধ্যে বুকে হাত জোড় করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন, এবং সহজে যেরূপ নিদ্রা আইসে সেইরূপে মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

——x——

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শোকের উপর শোক।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসার মিয়মতীব বিচিত্র ॥
কস্যত্বং বা কুতো আয়াত তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥

দাহ ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিবার জন্য অনাথবন্ধু মাতার মৃত শরীরের নিকট রহিলেন। ভগ্ন শরীর ভগ্ন হৃদয় পিতাকে ও মেয়েছেলেদের বাটিতে ফিরাইয়া লইয়া সংসার বাসার দ্বার পর্য্যন্ত গেলেন। ঘাট হইতে বাসা খুবই নিকট।

সেইদিন বৈকালে অনাথবন্ধু পিতার পার্শ্বে সময়োচিত বেশে বসিয়া আছেন। রামজয় বলিলেন,"ওত ভালয় ভালয় গেল, আমার অদৃষ্টে আরও কি আছে? কাল যখন রজনী জাহাজের তলায় পড়িয়াছে এবং উঠিতে পারিতেছেনা বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিল সে কষ্টের শব্দ তোমার মনে আছে? আর তার পর হইতেই রজনী আসিয়াছে, ওর কাছে কাছে আছে এইরূপ দুতিন বার বলিয়াছে তাহাও দেখিয়াছ? সেই চীৎকারের পর হইতেই আমার বুকের মাঝখানে কি একটা বেদনা হইয়াছে। আজ যাহা হইল তা যে হইবে, আজ কয়েক বৎসর হইতেই সকলেরই জানা কথা। তবে অনেক বার অসুখ কমে কমে আসে, এবারে অসুখটা যেন একটু বেশী কমে ছিল, তাই কলিকাতা থেকে

রাজবাড়ীর টেলিগ্রাম আসিলেও রজনী যথন কলিকাতায় ফিরে যেতে চাইলে না আমি তথন জিদ করে রজনীকে পাঠাইয়াছিলাম। ভাল কাজ করি নাই। রজনী দেখিতে পাইল না।—ওর বিশ্বাস যে, রজনী আসিয়াছিল।"

এই কথার পর বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাত দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা অনাথ! আজ ত রজনীর আসিবার কথা! রজনী আসিল না কেন?"

অনাথবন্ধু এই সমস্ত কথাই ভাবিতেছিলেন। পিতার কাতর বাক্যে তাঁহারও সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। রজনী কেন আসিয়া পঁহুছিল না, তাহার কোন সদুত্তর মনে হইতেছিল না। বিষম বিপদের আশঙ্কাই মনে উদিত হইতে লাগিল।

পিতার আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মস্তক স্কন্ধোপরি লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ ভাবে থাকিয়া রামজয় মাথা তুলিলেন। বলিলেন, "সংসার সবাইকে থামাইতে পারিতেছে না। তুমি একটু দেখ। সে গেছে কিন্তু তোমাদেরই আছে। স্বর্গে গিয়াও তোমাদেরই কল্যাণ প্রার্থনা করিবে। আমি একটু চুপ করিয়া পড়িয়া থাকি। আমার পনর বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই পিতামাতা যান। তাহার পর আজ ষাট বৎসর আমি কোন প্রকার শোক পাই নাই। প্রথম বয়সে কিছু দারিদ্র্য কষ্ট পাইয়াছিলাম মাত্র। চাকরী করিতে

করিতে কিছু অধিক বয়সে বিবাহ করি। সেই অবধি বোধ হয় আমার মত সুখী কেহ কখন ছিল না।”

বৃদ্ধ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই বিবাহ দিনের দশম বর্ষীয়া বালিকা পত্নীর ছবি দেখিতে পাইলেন। আর এই সুদীর্ঘকালের শত শত সহস্র সহস্র ভক্তি ভালবাসার কথা কয়েক মিনিটের মধ্যে মনের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। এতক্ষণে বৃদ্ধের চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল।

তিনি অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া অনাথবন্ধুকে বলিলেন, “তুমি ওঘরে যাও। আর সবাইকে দেখ।”

অনাথবন্ধু মাতৃবিয়োগের ও পিতার অসুস্থ শরীরের কথা ভাবিতে ভাবিতে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। পিতার এবারের স্বর তত শুষ্ক নয়—পিতার কাঁদিবার ক্ষমতা হইয়া তিনি কিছু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং ভগিনী স্ত্রী প্রভৃতির নিকট পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে গেলেন।

বলিলেন,“সবাই তোমরা বাবাকে দেখ। বাবা তোমাদের কান্নায় যেন আরও বেশী কষ্ট পাইতেছেন। চক্ষে মুখে জল দিয়া বাবার কাছে যাও। মা এখনও আমাদেরই আছেন। স্বর্গে গিয়া আমাদের সকলকে দেখিতেছেন।” বলিতে বলিতে অনাথবন্ধু মাটিতে বসিয়া পড়িলেন ও নিজে কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপে সে রাত্রি গেল।

ট্রেনের সময় পার হইলেও রজনী আসিল না দেখিয়াই অনাথবন্ধু কলিকাতায় রজনীর শ্বশুরকে, আনন্দনাথের

পিতাকে টেলিগ্রাফ করিলেন—"মাতা আমাদের ছাড়িয়া স্বর্গে গিয়াছেন। পিতা রজনীর সংবাদের জন্য বড়ইব্যাকুল। অবিলম্বে যেন উত্তর দেন।" রজনীকে ও পুনর্ব্বার টেলিগ্রাফ করিলেন।

পর দিন আনন্দনাথের পিতার নিকট হইতে জবাব আসিল, "এখানকার সংবাদ বড়ই ভয়ানক। রজনী সাঁকরাইলে একটি চিকিৎসায় গিয়াছিলেন। 'টগ' ষ্টীমারের ধাক্কায় উলুবেড়িয়ার ষ্টীমার ডুবি হইয়াছে। ঐ ষ্টীমারে রজনী সাঁকরাইল হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গের চাকর তীরে উঠিয়াছে। রজনীর সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বেহাইকে দেখিও। আনন্দকে কাশীতে রাখিয়া নিজেই বরং কলিকাতায় আইস।"

অনাথবন্ধু দ্বারের নিকটে অগ্রসর হইয়া গিয়া টেলিগ্রাম হাতে লইয়াছিলেন। উহা পড়িয়া অনাথবন্ধুর মাথা ঘুরিল। তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া বসিয়া পড়িলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে মাতা যে ভয়ানক ছবি দেখিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন, সেই চিত্র মনে উঠিল। 'স্নেহের ভ্রাতা ষ্টীমার ডুবিতে জলে পড়ায় সাঁতার দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু জাহাজের তলায় পড়াতে উঠিতে পারিল না!'

টেলিগ্রাম আসিয়াছে এই সংবাদ রামজয়ও পাইয়াছিলেন—মেয়ে ছেলেরাও শুনিয়াছিল। চাকর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো, তোমরা দৌড়ে এস, বড় বাবুর মুখে জল দাও, তিনি ভ্রমি গিয়াছেন।"

অনাথবন্ধুর মাথা ঘুরিয়া তিনি বসিয়া পড়িয়াছিলেন। পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইলেন, কিন্তু চাকরের চীৎকারে সকলেই দৌড়িয়া আসিল এবং তারের খবর যে বড়ই ভয়ানক তাহা বুঝিয়া সকলেরই হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল।

অনাথবন্ধুর মুখে জল দিতে হইল না। সংসার টেলিগ্রাম হাতে লইয়া একটু পড়িয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের একি হোল! বাবার কি হবে!"

অনাথবন্ধু বলিলেন, "বাবা একলা রহিয়াছেন"। এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ পিতৃ সমীপে গেলেন। বৃদ্ধ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় দুই হাতের উপর মুখ দিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছিলেন। পদ শব্দে মুখ তুলিয়া অনাথবন্ধুর রক্তহীন বিশুষ্ক মুখ দেখিলেন। শুষ্ক অথচ স্থির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথাকার জাহাজ?"

অনাথবন্ধু পিতার স্থৈর্য্যে বিস্মিত হইলেন এবং তাহা হইতে নিজেও যেন মনে একটু বল পাইয়া উত্তর করিতে পারিলেন, "সাঁকরাইল গিয়াছিল—উলুবেড়িয়ার জাহাজ।"

রামজয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমার কাছে তোমার মা স্বপ্নেও কখন মিথ্যা বলেন নাই। মৃত্যুকালে সবই তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন। সেই দিন থেকেই আমি এইরূপ সংবাদ কখন আসে কখন আসে তোলাপাড়া করিতেছি। মনের ভিতর কোনমতেই আশা হইতেছিল না। আমাকে এই ভয়ানক খবরের জন্ম তিনি অনেকটা প্রস্তুত করে গেছেন।

কখন কোন কাজে কি তাঁহার ত্রুটি হইত? বাবা রজনী!! আমার এ কি করে গেলি!"

অনাথবন্ধু পিতাকে ঘেঁষিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াছিলেন। কণ্ঠ শুষ্ক, দেহ কম্পিত, চক্ষে জল আসিতেছে না, যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন, এমনি বোধ হইতে লাগিল। রজনী নাই একি সম্ভব!

অনাথবন্ধুর কাঁধ হইতে মাথা তুলিয়া রামজয় বলিলেন তেমন "ঝড় ঝাপ্টার কথা কিছু কাগজে দেখা যায় নাই ত?"

অনাথবন্ধু। "টগ ষ্টীমারের ধাক্কায় জাহাজ ডুবি হয়েছে।"

রামজয় সোজা হইয়া বসিলেন, চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল, তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন "কি! মাতাল গোরা কাপ্তেনের গোঁয়ারতুমিতে আমার অমন রত্ন গেল! দেশের যে বিচার তাহার অবশ্যই কিছু হইবে না"।—পরক্ষণেই মৃদুস্বরে বলিলেন "ভগবানের মার। কত পাপই করিয়াছিলাম তাই এমন হইতেছে। বাবা অনাথ! আমার সব চেয়ে আশা যে রজনীর উপর ছিল! রজনী বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিবে বলিয়া যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল! সেই অহঙ্কারের জন্যই কি ভগবান আমার এমন করিলেন!"—

রামজয় আপনা আপনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "উদরাময় রোগ সম্বন্ধে যে অতি সুন্দর চিকিৎসা গ্রন্থ বাঙ্গালায় লিখিতেছিল, এই সেদিন যে তাহা আমাদের

শুনাইয়া গেল। বাঙ্গালাটা দশজন ডাক্তারে যদি ভাল বলেন তবে ইংরাজীটা, বাঙ্গালা হইতে অনুবাদিত বলিয়া পরে ছাপাইবে! বাঙ্গালী জাতির অদৃষ্ট—আর আমি মহাপাতকী বেঁচে রইলাম, আমার অদৃষ্ট। সে সতী সাবিত্রী সবাইকে রেখে গেছে। একষ্ট পেলেনা—জুড়িয়েছে!”

চারিদিকে রোদনের ধ্বনি। রজনীর মত পুত্র, রজনীর মত ভ্রাতা—রজনীর মত দেবর—রজনীর মত স্বামী যে পরিবার হইতে হঠাৎ এরূপে গিয়াছে সে পরিবারের যে কি শোক তাহা বাঙ্গালী পাঠককে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।

প্রথমে সংবাদটা যেন স্বপ্ন বলিয়াই বোধ হয়। পূর্ণ বিশ্বাসই হয় না। তাহার পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি যে হইয়াছে তাহা যেন বুঝিতে পারা যায় না!

মাতার স্বপ্ন দেখার পূর্ব্বদিন বৈকালে অনাথবন্ধু রজনীকে এই বলিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন যে, ‘মাতা অনেকটা সুস্থ আছেন।’—ডাক্তারেরা তাহাই বলিয়াছিলেন। নিজেরও পরিজনবর্গের দেখিয়া শুনিয়া তাহাই বোধ হইয়াছিল। কেবল কবিরাজ মাথা নাড়িয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে সকলেই স্থির করিয়াছিলেন যে কবিরাজ মহাশয় সহজেই মন্দ দেখেন এবং অন্যে যাহা বলিবে তাহার বিরুদ্ধ মত খ্যাপন করিতেই ভাল বাসেন। যে অপ্রিয় সংবাদ দেয় তাহার কথায় বিশ্বাস করিতে সহজেই প্রবৃত্তি কম হয়।

অনাথবন্ধুর এক্ষণে মনে হইতেছিল যে কবিরাজের মতে বিশ্বাস করিয়া যদি সেই দিনই রজনীকে আসিবার জন্য

টেলিগ্রাম করিতেন—'মাতা একটু ভাল আছেন' বলিয়া ভরসা দিয়া না পাঠাইতেন, তাহা হইলে রজনী সেই রাত্রেই চলিয়া আসিত—সাঁকরাইল যাওয়া হইত না। তাহা হইলে তাঁহার অমন ভাই এরূপে এ বয়েসে যাইত না! সকল সময়ে অনাথবন্ধু নিজের ত্রুটি দেখিতেই উন্মুখ।

কথায় বার্ত্তায় কার্য্য ক্ষমতায় রজনীই বাড়ীর সেরা। মনের উদারতায়, প্রীতি প্রবণতায়, চরিত্রের উৎকর্ষে, কাহারও অপেক্ষা কম নয়। নিজে ভাল ডাক্তার, মাতার চিকিৎসায় এবং সেবায় বরাবরই নিযুক্ত ছিল। কিন্তু তাহার কাশীতে আসা সম্বন্ধে পিতার মত না হওয়ায় মাতার সেবায় অনেকটা বঞ্চিত হইয়াছিল। মাতার এবারের অসুখে কোন চিকিৎসাতেই যে অধিক ফল কিছু হইবে না রজনী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। তবে "কবিরাজী ঘি তেলে যদি কিছু উপকার হয়" তাহার এই রূপ একটু আশা ছিল এবং সেই জন্যই সেই রূপ চিকিৎসার অনুমোদন করিয়াছিল। এবারে কলিকাতায় ফিরিতে চায় নাই, শেষে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছিল যে, প্রত্যহ বৈকালে যেন মাতার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছে, আবশ্যক হইলে সেই রাত্রেই রওয়ানা হইবে। কার্য্যও সেইরূপ হইতেছিল।

অনেকক্ষণ রোদনাদি হইলে রামজয় অনাথবন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন "সংসার এখানে থাকিল, তুমি কলিকাতায় যাও। যদি তাহার শরীর দেখিতে পাওয়া যায় দেখিবে

না? চাকর বাকরে বাসা লুঠপাঠ করিবে কিন্তু তাহার বহি এবং যন্ত্রাদি তাহার বড় যত্নের জিনিস ছিল। সেগুলি রক্ষা করা আবশ্যক। তাহার নিজের লিখিত কাগজ পত্র অমূল্য—সেগুলি বাঁচান উচিত। আর কোন জিনিস পত্রই নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। সেদিকে যতদূর সম্ভব বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া আসিবে। মানুষ কোন সময়েই কর্ত্তব্য ছাড়া নাই।”

একটু পরে বলিলেন, “ভগবানের মার কত শক্ত মার—পৃথিবী যে কি তাহা এতদিনে আমি সুস্পষ্ট বুঝিতেছি। তোমাদের, বৌমার, আর আমার প্রদোষের বড়ই অল্প বয়সেই জানিতে হইল! ভগবান এ বুড়া হাড় কতদিনে যে জুড়াইতে দিবেন তাহা জানি না! তোমার মার কাছে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই কি হইবে না? আমি তাহাকে বরাবর বলিতাম ‘তুই আগে যাস, কিন্তু আমার যেন তারপর মাস পার না হয়।’ তার ইচ্ছা মত সব হোল। আমি রজনীকে তার মার সেবা করিবার জন্য এখানে থাকিতে দি নাই, কিন্তু সে দেহ ছেড়েও (শোকে রামজয়ের স্বর ভগ্ন ও বাক্য রুদ্ধ প্রায় হইয়া আসিল) এসে তার মাকে নিয়ে গেছে।—রজনী! আমাকেত তুই কার চেয়ে কখন কম ভালবাসিস্ নাই—আমাকেও নিয়ে যা বাপ!”

সেই দিনই অনাথবন্ধু সজল নেত্রে ভগ্ন হৃদয়ে কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন। পিতা সঙ্গে একজন হিন্দু-

স্থানী চাকর দিলেন। কাশীতে লোকজন কম আছে প্রভৃতি অনাথবন্ধুর কোন আপত্তি শুনিলেন না। সংসারকে দিয়া অনাথবন্ধুর রওয়ানা হইবার কথা আনন্দনাথের পিতাকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন।

এই গভীর শোকের মধ্যেও সাবেক কালের ধরণে শিক্ষিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বৃদ্ধ, অনাথবন্ধুর এবং পরিবারস্থ অন্য সকলেরই যন্ত্রণা লাঘব চেষ্টা এবং সর্ব্ব প্রকারের তত্ত্বাবধান ত্যাগ করেন নাই।



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা।

নলিনীদলগত জলমতি তরলং, তদ্বজ্জীবিতমতিশয় চপলং;
বিদ্ধিব্যাধিব্যালগ্রস্তং, লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তং॥

অনাথবন্ধু মেল ট্রেণ হইতে ভোরবেলা হাবড়া ষ্টেসনে নামিয়া দেখিলেন যে, আনন্দনাথেদের বাড়ীর একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী তাঁহার জন্য ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছেন।

আনন্দনাথের পিতা সহৃদয় ব্যক্তি, তিনি অনাথের পিতার টেলিগ্রাম পাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য নিজেই ভোরবেলা ষ্টেসনে যাইতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার এ বয়সে অসুখ হইবার সম্ভাবনা বলিয়া বাড়ীর সকলে বিশেষ আপত্তি করায় একজন ভাল লোক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

বলিয়াছিলেন, "এমন বিপদের সময় যদি একটু ওদের না দেখিব, তবে বেঁচে আছি কেন? আহা! রজনীকে দেখ্‌লে যেন চক্ষু জুড়াইত। কলিকাতার সকল ভদ্র লোক যেন তাহার জন্য কাঁদিতেছে। কেবল জন কয়েক ডাক্তার তাহার পসারটা মনে করে হয় ত তত দুঃখিত নয়। × × × ডাক্তার নাকি বলেছে—'অত বেশী বাড়্‌লে সইবে কেন?'—এমন পাষণ্ডও বাঙ্গালীর ঘরে জন্মায়!"

অনাথবন্ধু নলিনীর শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া পঁহুছিলে আনন্দের পিতার নিকট সমস্ত শুনিলেন। রজনীর দেহ পাওয়া যায় নাই। পাইবার সম্ভাবনাও আর নাই। আনন্দনাথের পিতা জল পুলিসের সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর উভয় তীরে গ্রামে গ্রামে সন্ধান লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন। পুরস্কার দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ ষাটটী মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে, আরও বোধ হয় ততগুলিই পাওয়া যায় নাই, এই রূপই অনেকে আন্দাজ করিতেছে। জাহাজ ডুবিতে যাহারা মারা গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই ভদ্রলোকের বাড়ীর।

আনন্দনাথের পিতা রজনীর বাসায় রজনীর দরোয়ান ছাড়া নিজেরও দরোয়ান রাখাইয়াছেন, এবং ভিতরের ঘরগুলি বন্ধ রাখাইয়া বাহিরে নিজেরও একটা ভাল, তালা দেওয়াইয়াছেন। রজনীয় শ্যালক মাতাল অবস্থায় আসিয়া পূর্ব্বদিন বৈকালে যে অভদ্র ব্যবহার করিয়া গিয়াছিল, আনন্দ নাথের পিতা অনাথবন্ধুকে সে কথা কিছু বলিলেন না।

সে আসিয়া আনন্দনাথেদের সরকারকে বলিয়াছিল, "এখন বাসার সব জিনিস আমার ভগিনীর, তুমি চাবি দিবার কে? আমরা হেপাজত করিব। জিনিস যদি খোয়া যায় তবে তার দায়ী কে হইবে?" কথার জবাব কেহ দেয় নাই। কিয়ৎক্ষণ চেঁচাচেচি করিয়া অগত্যা চলিয়া গিয়াছিল। ছোঁড়ার বোধ হয় ইচ্ছা ছিল যে, এই সময়ে দু দশ বোতলের রেস্ত সংগ্রহ করিয়া লয়!

কলিকাতার অনেকস্থলে আচারভ্রষ্ট লোকেদের মধ্যে যে কত স্বার্থ-পরতা বৃদ্ধি হইতেছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং শিষ্টাশিষ্ট আচারের বোধ যে কত কমিতেছে, তাহা মনে করিলে ইংরাজী শিক্ষা হইতেই এত কালের পর বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে বলিয়া ভয় হয়। এখন কলিকাতায় বেতনভোগী ফিরিঙ্গি নর্স (শুশ্রূষাকারিণী) রাখিয়াই রোগীর সেবা আরম্ভ হইয়াছে। আত্মীয় স্বজনে 'কার্ড' রাখিয়াই সেবা সারিতে ইচ্ছুক ! আত্মীয় কাহার মৃত্যু হইলে জিনিস পত্র রক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে কতক চুরি ও কতক জিনিসপত্র নিলামে চড়াইয়া সস্তাদরে নিজেরাই কেনার উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে। তথায় কোন কোন স্থলে মৃতের সৎকার করিতে এখন আর আত্মীয়েরা যাইতে চাহে না। "শ্মশানধূমের" গভীর শিক্ষা কলিকাতার বাঙ্গালী ভদ্র লোকেরাও কেহ কেহ ত্যাগ করিতে উন্মুখ ! খৃষ্টানদের "সোয়ারিস কোম্পানির" ন্যায় দেশীয় অন্ত্যেষ্টি কোম্পানির প্রয়োজন হইয়া উঠিতেছে !

হাত মুখ ধুইয়া অনাথবন্ধু রজনীর বাসায় গেলেন। আনন্দনাথের পিতা তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন। অনাথ বন্ধু বলিলেন, " আপনার গিয়া কাজ নাই, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"

আনন্দনাথের পিতা বলিলেন, "এখন কলিকাতার বাসা তুলিয়া দাও। আমি লোকজন দিতেছি। সমস্ত জিনিস-পত্র এ বাটীর দুইটা খালি ঘরে আনিয়া বন্ধ করিয়া

রাখা যাইবে। খুকুরা জিনিসপত্র দুটা বড় সিন্দুকে বন্ধ করিয়া তুমি কাশীতে লইয়া যাইও। যদি স্নেহটী পাওয়া যায়, এই ভরসায় আমি তোমাকে আসিতে বলিয়াছিলাম। আহা! অমন ছেলে কি হয়। কি সর্ব্বনাশই হ'ল! আমার আনন্দের ছোট ভাই যেন গিয়াছে, এমনি মনে হইতেছে। আমার মাঝে অসুখ হইলে কি যত্ন ও সেবাই করিয়াছিল! কলিকাতা সুদ্ধ সকলেই হায় হায় করিতেছে। বেয়ান সকলকেরেখে গেছেন বলেই জেনেছেন। কিন্তু বেহাই কি যন্ত্রণাই পেলেন! কচি বৌটীর কি দশাই করে গেল!"

রজনীর বাসায় গিয়া তথাকার দৃশ্য অনাথবন্ধুর হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কাপড় চোপড়, জুতা চিঠিপত্র যেখানকার যাহা ঠিক রহিয়াছে। কেবল সেই স্নেহের ধন, অনেক আশার স্থল, গৃহের উজ্জ্বলরত্ন, বাল্যাবধি লেখা পড়া কথাবার্ত্তা আমোদ আহ্লাদ সুখ দুঃখের সহচর প্রাণের ভ্রাতা নাই! 'রজনী নাই' অনাথবন্ধুর যেন বিশ্বাসই হইল না। মনে হইল 'জলে ভাসিয়া গিয়া কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে কি উঠিয়া থাকিতে পারে না?' পরক্ষণেই মাতার স্বপ্ন দর্শন ব্যাপারের স্মৃতি সে আশা টুকুকে যেন দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

'রজনী নাই' এমন অবস্থা ত অনাথবন্ধু কখন একবারও ভাবেন নাই! নিজের শরীর অপটু নয়, কিন্তু রজনীর স্বাস্থ্য তিন ভ্রাতার মধ্যেই শ্রেষ্ঠ। রজনীই সকলের অপেক্ষা অধিক দিন থাকিবে। অনাথবন্ধুর অবর্ত্তমানে রজনীই

হাত দিয়া ছিল। কিরণশশী তথায় আসিয়া স্বামীর অতটা অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 'অমন করিয়া কি ভাবিতেছিলে বলিতে হইবে।' রজনী প্রথমে বলিলেন 'কত কি মনে হয় তা আর কি বল্‌ব।' স্ত্রী জেদ করায় বলিয়াছিলেন, এই ছেলের বিছানায় আমার পায়ে হাত দিয়া একটি সত্য কর।' কিরণশশী বলিয়াছিল 'কি এমন কথা তার জন্যে এত ?' রজনী বলে 'সংসার সম্বন্ধে সেইটিই আমার প্রধান কথা। সত্য না করিলে বলিব না।' কিরণশশী বলিয়াছিল 'আমি আর সব পারি—কিন্তু তোমাকে কি প্রদোষকে ছুঁয়ে কখন দিব্য করিতে পারিব না। লোকে বলে অমঙ্গল হয়। তবে তোমার কাছে সত্য করিতেছি।' তখন রজনী বলেন 'আমার বড় সাধ যে আমার এই ছেলে আমাদের বাড়ীর মতন হয়। গুরুজনে ভক্তি ও স্বভাব চরিত্র ভাল—লেখা পড়ায় মন থাকে। যদি বাঁচিয়া থাকি যথা সাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু ও মানুষ হবার আগে যদি আমি যাই তাহা হইলে তুমি যদি তোমার বাপের বাড়ীর দিকে ঘেঁস! যদি তোমার বাপের বাড়ীর মত ছেলে হইয়া যায়! তুমি যদি স্বীকার কর যে আমার অবর্ত্তমানে ছেলেকে তোমার বাপের বাড়ীর সহিত অধিক মিশিতে দিবে না, আমাদের বাড়ীতেই রাখিবে—বাবা থাকুন, দাদা থাকুন, সংসার থাকুক, কেহই না থাকিলেও এই পরিবারের মধ্যেই রাখিবে তাহা হইলে আমার মনটা বেশ শান্ত হয়। তুমি যদি আগে